দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
'করুণা প্রকাশনী'
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
বিষ্ণুপদ চৌধুরী
প্রিন্ট হোম
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
মদন সরকার

বর্তমান গ্রন্থটি মানুষের স্থূল দেহের অন্তরালে স্বচ্ছ-সত্তার কাহিনী, যে সত্তার স্বরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে গূঢ় দেহতত্ত্ব, জীবাত্মা, মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থা, দিব্যদর্শন ও দৈবী ভাষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কেউ এ বিষয়ে আরও বেশি জানতে চান তাহলে লেখকের সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে (পাঁচ খণ্ড), 'সহস্রারের পথে' ও 'একান্ন পীঠের সাধক' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে দেখতে পারেন। তবে এ গ্রন্থ কোন পঠিত বিদ্যার দ্বারা রচিত নয়, সাধনার দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর লিখিত।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

মহাতীর্থ একাম্র পীঠের সন্ধানে (৩য় সংস্করণ)

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে [১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড]

সহস্রারের পথে

পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত (যন্ত্রস্থ)

একাম্র পীঠের সাধক

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

গীতা, চণ্ডী ও ভারতের দেবদেবী

মাতৃদেবী

৺ স্নেহলতা সরকার

ও

পিতৃদেব

৺ অমৃতলাল সরকার-এর

পুণ্যস্মৃতি স্মরণে।

ভূমিকা

একটি অলৌকিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে এই গ্রন্থের ভূমিকা শুরু করা যেতে পারে।

ত্রিশ কি একত্রিশ বছর আগে আন্দামানের কয়েকটি দ্বীপে জঙ্গল নির্মূল করে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য গ্রাম বসানো হচ্ছিল। এই সব পুনর্বাসনের তথ্য যোগাড় করতে সেখানে গিয়াছিলাম।

প্রায় বছরখানেক এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে ছোটাছুটি ক'রে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। ওষুধে আর কাজ হচ্ছিল না। ওখানকার ডাক্তাররা কলকাতায় ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন।

সে সময় প্রতি তিন সপ্তাহের মাথায় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজ ভারতের মেইনল্যান্ডে আসত। পর পর দু'বার কলকাতায় যাবার পর একবার যেত মাদ্রাজে।

আমি যখনকার কথা বলছি সেবার জাহাজ মাদ্রাজ যাবে। সরাসরি কলকাতায় ফিরতে হলে আমাকে পুরো তিনটি সপ্তাহ পোর্ট ব্লেয়ারে অপেক্ষা করতে হয়। ঠিক করলাম, মাদ্রাজে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফিরব।

আন্দামানে মহেশ পুনেকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে আমারই সমবয়সী। মহেশ বম্বের একটি ইংরেজি দৈনিকে কাজ করত। উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং' করতে সে আন্দামানে যায়।

মহেশও স্থির করে ফেলল আমার সঙ্গেই মাদ্রাজ যাবে এবং ওখান থেকে বম্বের ট্রেন ধরবে।

মাদ্রাজ এসে আমার এবং মহেশের কারোই কলকাতা বা বম্বে যাওয়া হ'ল না। বয়স তখন কম, দু'জনেরই পায়ের তলায় সর্ষে। এখানে যখন এসেই পড়েছি, দক্ষিণ ভারতটা না দেখে বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না।

মাউন্ট রোডের কাছে একটা ছোট হোটেলে উঠে দু-চারদিন

শহর এবং আশেপাশের 'টুরিস্ট স্পট'গুলো ঘুরে দেখলাম। তারপর এক সন্ধ্যায় দু'জনে কোচিনের ট্রেনে চড়ে বসলাম।

তিরিশ বছর আগে ভারতবর্ষে এত মানুষ ছিল না। পপুলেশসন এক্সপ্লোসান বা জন-বিস্ফোরণ এই কথাগুলো আজকাল আকছার শোনা যায়। তখন এসব ভাবাও যেত না। তবু আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামারটির কোনো সীটই ফাঁকা ছিল না।

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে এক সাধু—হ্যাঁ সাধুই বলা যায় তাঁকে—আমাদের কম্পার্টমেন্টে উঠলেন। বেশ কিছু লোকজন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। দেখেই বোঝা গেছে এরা সাধুর ভক্তের দল।

মহেশ আর আমি যেদিকে বসেছি তার উল্টোদিকের সীটে কম্পার্টমেন্টের দেয়াল ঘেঁষে সাধুকে সযত্নে বসায় ভক্তেরা। তারপর ট্রেন ছাড়ার আগে প্রণাম করে নেমে যায়।

সাধুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কালো পাথরে-কাটা মজবুত স্বাস্থ্য তাঁর। মাথার চুল আধাআধি সাদা হয়ে গেলেও শরীরে বার্ধক্য বা জরার ছাপ পড়েনি বিন্দুমাত্র। পরনে লাল টকটকে লুঙ্গি এবং ঢোলা ফতুয়া। কপালে গোলা সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল তান্ত্রিক বা ঐ জাতীয় কেউ।

সাধু সন্ন্যাসী এর আগে বিস্তর দেখেছি। কিন্তু এই মানুষটির মতো এমন জ্বলজ্বলে অন্তর্ভেদী চোখ আর কখনও দেখিনি। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব।

মাদ্রাজ থেকে ট্রেন ছাড়ার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। মাঝপথে একটি স্টেশনে কোচিন এক্সপ্রেস থামতেই চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক আমাদের কামরায় উঠল। রোগা লম্বাটে চেহারা, চোয়াড়ে মুখ। তার ভাবভঙ্গিতে অসহিষ্ণুতা আর ঔদ্ধত্য মাখানো।

ছোকরা যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নয়, দেখামাত্রই টের পাওয়া

যায়। বসবার জন্য চনমন ক'রে এধারে ওধারে তাকিয়ে একটু জায়গা খুঁজছিল সে। হঠাৎ তার নজর এসে পড়ে সাধুর ওপর। তাঁর পাশে ছোট একটি ব্যাগ রয়েছে।

যুবকটি সোজা সাধুর কাছে গিয়ে ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রাখতে বলে।

যতদূর মনে আছে, ছোকরাটি খুব সম্ভব তামিলভাষী এবং সাধুর মাতৃভাষা কন্নড় বা মালয়ালম। দু'জনে ইংরেজিতে কথা বলছিল, তাই বুঝতে পারছিলাম।

সাধু জানালেন, ব্যাগটা সরালেও যে জায়গাটুকু হবে তাতে একটি লোকের পক্ষে বসা সম্ভব নয়।

উগ্র ভঙ্গিতে চিৎকার জুড়ে দিল ছোকরা। ব্যাগ নামাতেই হবে। সাধুর যুক্তি, ঐটুকু জায়গায় কারো পক্ষে যখন বসা সম্ভব নয় তখন ব্যাগ নামাবার প্রয়োজন নেই।

ছোকরার চেঁচামেচি বাড়তেই থাকে। কামরার আবহাওয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমরা, কামরার অন্য যাত্রীরা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকি।

হঠাৎ ছোকরা বলে, 'আপনারা সাধুরা বিনা টিকেটে আরাম ক'রে সীটে লটবহর চাপিয়ে যাবেন। আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্র্যাভেল করব!'

সাধু এতক্ষণ ছিলেন খুবই শান্ত এবং উত্তেজনাশূন্য। এবার তিনি রেগে গেলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে একটি টিকেট বের করে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'আমি বিনা টিকেটে যাচ্ছি না। এই দেখ আমার টিকেট।'

ছোকরা অত্যন্ত ইতর। সে গলা আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'টিকেটই দেখান আর যাই করুন, আপনারা ভণ্ড, হিপোক্রিট—'

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল ছোকরার গালে একটা চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু তার আগেই

বিরক্ত অসন্তুষ্ট সাধু তাঁর ব্যাগটি নিয়ে উঠে পড়েছেন। বললেন, 'বসতে চাও? ঠিক আছে—ব'সো।'

ছোকরা এমনই নির্লজ্জ যে তৎক্ষণাৎ সাধুর সীটে বসে পড়ে।

সাধু বলে নয়, একজন বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন, ভাবতেও খারাপ লাগছিল। মহেশ আর আমি সরে সরে বসে তাঁকে জায়গা করে দিলাম।

সাধু নির্বিকার ভঙ্গিতে বসতে বসতে চাপা নিচু গলায় বললেন, 'ছোকরা আধ-ঘণ্টার ভেতর মারা যাবে, আর কয়েক ইঞ্চি জায়গার জন্যে কিনা ঝগড়া করল!'

মহেশ আর আমি দু'জনেই নির্ভুল শুনতে পেলাম। হাসলাম শুধু। কথাগুলোর মধ্যে যে অমোঘ সংকেত রয়েছে তখনও বুঝতে পারিনি। রেগে গেলে অনেকেই তো বলে 'বড্ড বাড় বেড়েছে, নিশ্চয়ই মরবে।'—এর বেশি গুরুত্ব আমরা তখনও সাধুর কথায় দিই নি।

ছোকরা যেখান থেকে উঠেছিল তারপর দশ মিনিটও কাটে নি, আরেকটা স্টেশন এসে গেল। মিনিটখানেক থামার পর আবার ট্রেনের দৌড় শুরু হ'ল। টাইম টেবল আগেই দেখা ছিল, এবার কুড়ি মিনিট বাদে পরবর্তী স্টেশন আসবে।

একটানা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পর ট্রেনের গতি কমে এল। আর তখনই সেই ছোকরা উল্টোদিকের সীট থেকে উঠে দরজার কাছে চলে গেল। খুব সম্ভব সে পরের স্টেশনটায় নামবে।

আমরা সেই মুহূর্তে যেখানে আছি সেখানে পর পর চারটে রেল লাইন। আমাদের বাঁ দিকে প্রথম লাইনটা ফাঁকা। কোচিন এক্সপ্রেস দ্বিতীয় লাইন দিয়ে ছুটছে। আমাদের ডান দিকে আরো দুটো লাইন।

ট্রেনের স্পীড ক্রমশ আরো কমে আসছে। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই ছোকরা কখন যেন দরজা খুলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার তর সইছিল না, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই বোধ হয় লাফিয়ে নেমে পড়বে।

কোচিন এক্সপ্রেস সোজা লাইনে ছুটতে ছুটতে তার বিশাল শরীরে ক্ষিপ্র একটি মোচড় দিয়ে দ্বিতীয় লাইন থেকে হঠাৎ চতুর্থ লাইনে চলে গেল। আর তখনই ঘটে গেল মারাত্মক অঘটন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দরজার কাছ থেকে ছিটকে ট্রেনের বাইরে বেরিয়ে গেল সেই ছোকরাটি। আগে লক্ষ্য করি নি, প্রথম লাইন দিয়ে বেরিয়ে আসছে অন্য একটি ট্রেন, সেটা মাদ্রাজের দিকে যাবে। ছোকরা সোজা গিয়ে পড়ল সেই ট্রেনের ইঞ্জিনটার সামনে। পলকে সব শেষ।

এমন ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি। আমার হৃৎস্পন্দন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মতো সাধুর ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে পড়ে গেল—আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটির মৃত্যু হবে। ঘড়িতে দেখলাম তখনও আটাশ মিনিট পার হয় নি।

বিভ্রান্তের মতো মহেশ এবং আমি সাধুর দিকে তাকাই। তাঁর চোখমুখ ভবেলেশহীন, নির্বিকার। এত ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা যে ঘটে গেল, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া নেই। নিরাসক্ত মুখে তিনি বাইরে তাকিয়ে আছেন।

এদিকে কোচিন এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকে গিয়েছিল। উল্টো-দিকের মাদ্রাজগামী ট্রেনটাও থেমে গেছে। চারিদিকে হৈচৈ, চিৎকার, মানুষজন এবং রেলপুলিশের ছোটাছুটি।

প্রায় ঘণ্টাছয়েক আটকে থাকার পর কোচিন এক্সপ্রেস আবার চলতে শুরু করল। ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি, সাধুর সঙ্গ ছাড়ব না। তিনি যদি কোচিন পর্যন্ত যান ভালই, নইলে যেখানে নামবেন সেখানেই নেমে পড়ব। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছেলেটির যে মৃত্যু ঘটবে, কী ক'রে তিনি বললেন, আমাকে জানতেই হবে। ট্রেনে এত মানুষের সামনে এ জাতীয় আলোচনা হতে পারে না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে মহেশ বলল, সাধুকে সে-ও ছাড়ছে না। ছোকরার মৃত্যু তাকেও বিচলিত করে তুলেছে।

ভোরের দিকে, তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি, ট্রেন একটা মাঝারি স্টেশনে এসে থামে। সাধু তাঁর ছোট ব্যাগটি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন। আমরাও কাঁধে এবং হাতে হোল্ড-অল আর সুটকেশ ঝুলিয়ে নামলাম।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল রিকশায় উঠে সাধু রিকশাওয়ালাকে কোথায় যেতে হবে, জানিয়ে দিলেন। আমরা অন্য একটা রিকশা নিয়ে ঝানু গোয়েন্দার মতো তাঁর পিছু নিলাম।

খানিকটা যাবার পর সাধু আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেলেন। পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হালকা ধরনের কিছু গলাগাল দিলেন।

আমরা উত্তর দিলাম না।

কিছুক্ষণ পর আমাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তোড়ে রীতিমত খিস্তিই শুরু করে দিলেন সাধু। চোখমুখ দেখে মনে হ'ল প্রচন্ড রেগে গেছেন। আমরা কিন্তু তাঁর এই সব সুভাষিতবলী এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে লাগলাম।

মিনিট পনের বাদে একটা ছোট ভেজিটারিয়ান হোটেলে ঢুকলেন সাধু এবং দোতলায় একটি ঘর দখল করলেন। আমরা তাঁর পাশের ঘরটি ভাড়া নিলাম।

হোটেলটি খুব সাদামাঠা ধরনের। সারি সারি খান ছয়েক ঘর দোতলায়। সামনের দিকে টানা বারান্দা। বারান্দায় বসার জন্য চার পাঁচটা বেঞ্চ পড়ে রয়েছে।

মহেশ আর আমি ঠিক করে ফেললাম, সাধুর ঘরের সামনে বসে সারাক্ষণ পাহারা দেব। দেখা যাক, কতক্ষণে তাঁর করুণা লাভ করা যায়।

মহেশ যখন স্নান করে খেতে যায়, আমি অপেক্ষা করি। আমি খেতে গেলে সে বসে থাকে। যখনই সাধু দরজা খোলেন দেখতে পান একজন না একজন মূর্তিমান ঘাঁটি গেড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিতে দিতে ঝড়াং করে দরজা বন্ধ করে দেন

তিনি। অবশ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী হোটেলের লোকেরা তাঁর ভাত ডাল ইডলি দোসা কফি নিয়মিত চার বার ঘরে দিয়ে যাচ্ছে। হোটেলটা ছোট হলেও অ্যাটাচড বাথরুম আছে। কাজেই তেমন জরুরি কাজ না থাকলে ঘর থেকে না বেরুলেও চলে।

এইভাবে গোটা দিন এবং রাতটা কেটে গেল। পর পর দু রাত এক সেকেন্ডও ঘুমোতে পারি নি। চোখ জ্বালা করছিল। কপালের দু'ধারে রগগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। একটি আস্ত দিন এবং দু'টি রাত সাধুর পেছনে লেগে থাকার পর নগদ প্রাপ্তি যেটুকু জুটল তা হ'ল অকথ্য গালাগাল। আমরা ঠিক করে ফেললাম, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। এবার স্টেশনে গিয়ে কোচিনের ট্রেন ধরব।

সাধুর ঘরের সামনে বসে আমরা যখন হতাশভাবে ইত্যাকার আলোচনা করছি, দরজা খুলে সাধু ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা কিছু বুঝবার আগেই দু'জনের চুলের ঝুঁটি ধরে তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'কী জানতে চাস বল্।'

যিনি দু'দিন প্রচন্ড খিস্তিখেউড় করে আমাদের ভাগাবার চেষ্টা করেছেন ইনি যেন সেই মানুষটি নন, সম্পূর্ণ আলাদা কেউ। তাঁর দু'চোখে এমন কিছু সম্মোহন রয়েছে যা অনেকক্ষণ আমাদের বিহ্বল করে রাখে।

এক সময় বললাম, 'আপনি পরশু ট্রেনে নিজের মনে বলেছিলেন সেই ছেলেটি আধ ঘণ্টার ভেতর মারা যাবে। আমরা তা শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছিস।'

'আপনার চেহারা পোশাক, এইসব দেখে মনে হয় তন্ত্র সাধনা করেন। ঐ ছেলেটির ইতরামির জন্য বিরক্ত হয়ে এমন কিছু কি করেছিলেন যাতে তার অপমৃত্যু ঘটল। শুনেছি তান্ত্রিকদের প্রচন্ড ক্ষমতা।'

সাধু হাসলেন। বললেন, 'অনিষ্ট করার কোনো ক্ষমতাই কারো নেই। জন্ম মৃত্যু সব কিছুই দৈবের অধীন। তবে কেউ

কেউ তা দেখতে পায়। ঐ ছেলেটি যখন ট্রেনে ওঠে তখনই বুঝেছিলাম ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।'

মহেশ বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে ওকে তো বাঁচাতে পারতেন।'

সাধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে?'

'অ্যাকসিডেন্ট সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে।'

'আমার কথা ও শুনত না। আগেই বলেছি সব কিছুই দৈবের অধীন। তা ঠেকাবার শক্তি কারো নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বললাম, 'আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

সাধু রহস্যময় হেসে বললেন, 'বোধ হয় পারি। ইচ্ছে হলে লিখে নিতে পারিস।'

প্রথমে মহেশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সাধু। সে টুকে নিল। পরে আমার পালা।

ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে, এ রকম কুড়িটি ঘটনা জানিয়ে সাধু বললেন, 'এবার কিন্তু একটা সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী করব। সহ্য করার ক্ষমতা আছে?'

অল্পক্ষণ ইতস্তত করে এক রকম মরিয়া হয়েই বললাম, 'আছে। আপনি বলুন।'

'এখন থেকে দু'বছর পর অক্টোবর মাসে তোর পরের ভাইয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে।'

ভয়ে আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আমি আর কিছু জানতে চাই নি।

সত্যিই দু'বছর বাদে অক্টোবর মাসেই আমার মেজ ভাই কলকাতায় বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়।

অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আগে আমার সামান্য আগ্রহও ছিল না কিন্তু সাধুর কথা নির্ভুল ফলতে দেখে এ বিষয়ে উৎসুক হই।

শুনেছি হাতের রেখা দেখে বা কোষ্ঠি বিচার করে অনেকেই ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। কিন্তু কোচিন এক্সপ্রেসের সেই

সাধু আমার বা দুর্ঘটনায় মৃত যুবকটির হাত কিংবা কোষ্ঠি কিছুই দেখেন নি। তবে কীভাবে এমন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? এই প্রশ্নটি দীর্ঘকাল আমাকে আলোড়িত করে রাখে।

আমার ভাই-এর অকালমৃত্যুর পর সারা ভারতবর্ষে বহু তান্ত্রিক কাপালিক ফকিরসন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসি। এই একই প্রশ্ন তাঁদেরও করেছিলাম। বেশির ভাগের কাছ থেকে উত্তর মেলে নি। অন্যেরা বলেছেন, জানেন না। হয়তো জানলেও এড়িয়ে গেছেন।

মাদ্রাজের সেই ঘটনাটির প্রায় তিরিশ বছর পর করুণা প্রকাশনীর অফিসে নিগূঢ়ানন্দের সঙ্গে আমার আলাপ। নিগূঢ়ানন্দ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। তার কয়েকটি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে।

কথায় কথায় কোচিন এক্সপ্রেসের সেই সাধুর প্রসঙ্গ উঠল এবং আমার উত্তর-না-পাওয়া প্রশ্নটির কথাও জানালাম। নিগূঢ়ানন্দ বললেন জ্যোতিষশাস্ত্র না জেনেও উপস্থিত বা অনুপস্থিত যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। দৃশ্যমান পৃথিবীর বাইরে সূক্ষ্ম দৈব একটি জগৎ এবং তার নিজস্ব দৈবী একটি ভাষা রয়েছে। তবে আমাদের পরিচিত সীমাবদ্ধ অক্ষরমালার বাইরের সেই ভাষাটি আয়ত্ত করতে না পারলে গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

নিগূঢ়ানন্দ জানালেন, অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং তার অলৌকিক ভাষা সম্পর্কে একটি বই লিখছেন এবং করুণা প্রকাশনী থেকে সেটি প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। আমার কৌতূহল তখন এতই প্রবল যে ছাপানো ফর্মাগুলো প্রকাশকের কাছ থেকে চেয়ে বাড়ি নিয়ে আসি এবং প্রায় এক নিঃশ্বাসেই পড়ে ফেলি। যে প্রশ্নের উত্তর এতকাল খুঁজে বেড়িয়েছি, নিগূঢ়ানন্দের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা'য় তা পেয়ে যাই। কোনো প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে

অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তরদাতা সিনেমার স্লাইডের মতো চোখের সামনে নানা রকম প্রতীক, সংকেত এবং ইঙ্গিতময় চিত্র দেখতে পান। তার মধ্যেই উত্তরটি নিহিত থাকে। এ ভাষা যার তার পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এ জন্য দীর্ঘকালের সাধনা প্রয়োজন। তা ছাড়া নিজেকে নির্লোভ, নিরাসক্ত, অসূয়াহীন এবং শুদ্ধ রাখতে হয়।

নিগূঢ়ানন্দের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা'য় ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার একটি প্রায় অজানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ যোগ্য সমাদর লাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রফুল্ল রায়



কলিন ইভান্স (Colin Evans) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের কন্‌ওয়ে হল-এ জনসমক্ষে এই ভূমিত্যাগ প্রদর্শন করেন।



আত্মশক্তি বিশারদ বনইগারের জনৈক ছাত্র নিজের আত্মশক্তি প্রয়োগ করে একটি শিশুকে নিরাময় করছেন। এই আত্মশক্তিকে বলে P. K. অর্থাৎ Psychokinesis.

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

একজন মানুষের নিজের সারা জীবন সে যদি সুবিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে তাহলে জীবনের ঘটনাপ্রবাহের অন্তরালে সে এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারবে যা প্রকৃতপক্ষে কৌতূহলপ্রদ ও চমক সৃষ্টিকারী। অন্তত আমি যদি আমার ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকাই তাহলে এমনতর চিন্তা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে বাস্তববাদীর বিচারে যার কোন ব্যাখ্যা চলে না। এমন বহু ঘটনা বর্তমান লেখকের জীবনেই ঘটেছে। সে-সব ঘটনা কেমন করে কিভাবে ঘটল পার্থিব বিচার বিশ্লেষণে অন্তত আমি নিজে তার কোন হদিস পাইনি।

এমনতর ঘটনার পেছনে নিয়তির একটা হাত আছে বলে অনেকে মনে করেন। এই নিয়তি অদৃষ্ট। সাধারণের ধারণা, সব কিছু ঘটনার পেছনেই রয়েছে বিধাতাপুরুষের অদৃষ্ট লিখন। অর্থাৎ জন্মকালে তিনি কার জীবনে কি ঘটবে তা লিখে দেন। সেই লেখা অনুযায়ীই মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। এ-সব ধারণা অবশ্যই পৌরাণিককাহিনীপ্রসূত। পুরাণ অনেক সত্যকে সাধারণের পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য গল্পের আকারে পরিবেশন করে। গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্য প্রতীকের মাধ্যমে একটি সত্যকে বর্ণনা করা। কিন্তু কালক্রমে এই প্রতীকার্থ লোকে বিস্মৃত হয়ে যায়। তখন প্রতীকের বহিরাবরণরূপী যে গল্প তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতীকার্থ বর্জিত হয়ে গল্পগুলি তখন অবিশ্বাস্য ননসেন্সে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাহিত্যে এইভাবেই পুরাণের মাধ্যমে কলঙ্ক পড়েছে। সভ্য জাতি অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে বর্বর বলে ভাবতে শিখেছে।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও অধ্যাত্ম সত্য হারিয়ে গিয়ে কতকগুলি কুসংস্কারণই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং জন্ম জন্ম ধরে তারা সেই কুসংস্কার অনুসরণ করে তাকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছে। রক্ষণশীল মানসিকতার জন্য কিছুতেই এর বাইরে সে যেতে চায় না। এমনি করেই একদিন মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রশ্নটাও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভারতবাসীর মনে। নইলে স্থির মস্তিষ্কে বিচার করলে পুরাণের বহু গল্পই আপাত অর্থে গ্রাহ্য হতে পারে না। যেমন পরশুরামের কথাই ধরা যাক। পরশুরাম দশ অবতারের এক অবতার। অবতার বলতে আমরা বুঝি দেহ ধারণ করে জগতে ঈশ্বরের আর্বিভাব। জৈবিক দেহ ধারণ করলেও প্রাণিকুলের কাছে তিনি নমস্য। এই নমস্য হবার জন্য এমন কতকগুলি গুণ তাঁর মধ্যে প্রকটিত হয়, সেগুলি শ্রদ্ধাযোগ্য। যেমন, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা, সত্যভাষণ, অহিংস মনোভাব, জীবে প্রেম ইত্যাদি। কিন্তু পরশুরামের কাহিনী যদি বিচার করি, তাহলে তাঁর মধ্যে এমন কোন শ্রদ্ধা করার মত গুণই নেই। তিনি মাতৃহত্যা করেছিলেন। হিংসার বশবর্তী হয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রীয় করেছিলেন। একটা মানুষ যে-গুণে দৈবীসত্তা প্রাপ্ত হয় সেগুণও তাঁর ছিল না। যেমন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ ঠিক পরশুরামের বিপরীত মেরুর লোক। শত পুত্র নিহত হলেও তিনি বিশ্বামিত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। এইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আত্মবশ। বশিষ্ঠ শব্দের অর্থ হল আত্মবশ। সেই বশিষ্ঠের উদাহরণের পাশে হিংসায় উন্মত্ত পরশুরাম কি করে অবতার অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণাবলী নিয়ে অবতার হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন? আসলে এই গল্পটির একটি প্রতীকার্থ আছে। প্রতীকার্থ এই রকম: মাতা মানে energy, জগৎ। শূন্যতার বুকে সুপ্ত এই energy বা শক্তি স্বভাবগুণে ফুটে উঠে গোলাকার জগৎ তৈরী করে। এই জগৎকে

হনন করে অর্থাৎ জয় করে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় করে সেই শূন্যতায় ফিরে যিনি যেতে পারেন তিনিই ঈশ্বররূপে গ্রাহ্য হন। পরশুরাম এই জগৎকে জয় করে নির্গুণ শূন্যতায় স্থিত হতে পারতেন। সুতরাং তিনি ছিলেন ঈশ্বরতুল্য। জগৎ অর্থাৎ শক্তিজয়ী হিসেবে তিনি মাতৃঘাতী। কারণ শক্তিকে স্ত্রীলিঙ্গ বা মাতারূপে কল্পনা করা হয়। ক্ষত্রীয় হলেন তিনিই যার মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রাধান্য বেশী থাকে। কোন সাধক একুশ দিন সমাধিস্থ থাকলে এই রজঃ ও তমঃ গুণ সম্পূর্ণ নাশ হয়। তখন তিনি ঈশ্বরের নির্ভেজাল সত্ত্ব গুণের অধিকারী হন। পরশুরাম একুশ দিন সমাধিস্থ থেকে এই জড়প্রধান দুই গুণ অর্থাৎ রজঃ ও তমকে জয় করতে পেরেছিলেন বলেই একুশবার ক্ষত্রীয়নিধনকারী রূপে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি কুঠারধারী। এই কুঠার নরহত্যার প্রয়োজনে ব্যবহৃত কুঠার নয়। এ হল জ্ঞানকুঠার যার দ্বারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারকে ছেদন করে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্য অদ্যাবধি শৈব সাধকেরা কুঠার প্রতীক ধারণ করে থাকেন। গল্পের এই প্রতীকার্থ খুঁজে পেলে পরশুরামের অবতারত্বের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই প্রতীকার্থ ধরা না গেলে তা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাতুল্য হয়।

ঠিক এমনিভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দুশ্চরিত্র লম্পটে পরিণত হন, যদি তাঁর নানা লীলা-কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থ ধরা না পড়ে। গোপিনীদের বস্ত্রহরণ তো পর্ণোগ্রাফির গল্প পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া ষোল হাজার পত্নীও সুসংযমী চরিত্রের পরিচায়ক নয়। কিন্তু গোপিনীদের যদি জীবাত্মা বলে ধরি, এবং বস্ত্রকে যদি কামনা-বাসনার পাশ বলে ধরি 'তাহলে অশ্লীল গল্পটি অতি শ্লীল ও মহৎ ভাবাদর্শে উদ্বোধিত হয়। জীব সকল পাশ-বন্ধন মুক্ত হলেই অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পায়, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

সাক্ষাৎ পায় বা তাঁকে লাভ করে। ষোল হাজার পত্নী হল তাঁর ষোল হাজার গুণের প্রতীক। গুণই পুরুষের স্ত্রী হিসেবে কল্পিত।

পুরাণ কাহিনীতে চিত্রগুপ্তের একটি গল্প আছে। তিনি নাকি মানুষের সকল কর্মের হিসেব রাখেন। মৃত্যুর পর হিসেবের খাতা খুলে মানুষের কর্ম অনুযায়ী তাকে নরক বা স্বর্গবাসের অনুমতি দেন। গল্পটি হাস্যকর প্রমাণিত হবেই—যদি না তার অন্তর্নিহিত সত্যকে ধরা যায়। আসলে জড় জগতের অন্তরালে সূক্ষ্ম এক জগৎ আছে, যেমন নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে দৃষ্টি-গ্রাহ্য আলোর বাইরে একটি সূক্ষ্ম আলো আছে। সেই সূক্ষ্ম জগৎ সূক্ষ্ম আলোর মতই আমাদের কাছে থেকে গুপ্ত থাকে। সেই সূক্ষ্ম জগতের চরিত্র অনেকটা ফটোর নিগেটিভের মত। মানুষের কর্মজনিত তরঙ্গ (vibration) তাতে কর্মকারীর সম আকৃতির তরঙ্গ সৃষ্টি করে ফটোর নিগেটিভের উপর দাগ ফেলার মত ব্যক্তিমানুষের সূক্ষ্ম ছাপ ফেলে যায়। তাতে কর্মজনিত কম্পনের ফল স্বরূপ তার সূক্ষ্ম চিত্র ফুটে ওঠে। এই চিত্রটি সাধারণ মানুষের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে গুপ্তভাবে থাকে বলেই একে 'চিত্রগুপ্ত' বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে চিত্র গুপ্ত। সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী সাধক সেই সূক্ষ্ম চিত্র দেখতে পেয়ে প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথাই চিত্রগুপ্তের কাহিনী আকারে পুরাণে স্থান লাভ করে আছে। সেই পুরাণ পড়ে কেউ যদি চিত্রগুপ্ত হাত পা-ওয়ালা কোন জীব বলে ধরে নেন, যিনি মুদিখানার হিসেব রক্ষকের মত হিসেব লিখে চলেছেন, তাহলে এর চাইতে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের কাহিনীকে সত্য বলে যিনি গ্রহণ করেন তিনি অজ্ঞ এবং বর্বর ছাড়া আর কি হতে পারেন? এইভাবেই পুরাণ বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়ে আছে। সুতরাং বিধাতার ললাটলিখনও সেই ধরনের একটি কাহিনী সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, কথাটি হচ্ছে এই যে, একদল লোক ব্যাখ্যার অতীত জীবনের বহু ঘটনাকে বিধাতাপুরুষের ললাটলিখন বলে ধরে নেন। এবং সেখানে যা লিখিত আছে তা ঘটবেই এবং তাকে অতিক্রম করা যাবে না এরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু একজন খেয়ালী বিধাতাপুরুষ কপালে আপন মর্জিতে যা খুশি তাই লিখে দেবেন এবং জীবকে তাই ভোগ করতে হবে এমন কোন কাহিনীতে বর্তমান লেখকের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। হাত পা-ওয়ালা কোন বিধাতাপুরুষ বা ঈশ্বর আছেন বলে কোন তত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি মানুষ পৃথিবীতে নিজস্ব কর্মফলই ভোগ করে। তাঁর সুখ দুঃখের স্রষ্টা সে নিজেই, অন্য কেউ নয়। তাঁর কর্মফলই গুপ্ত চিত্র হিসেবে চিত্রগুপ্তের (আত্মার) খাতায় তার ভবিষ্যৎকে এঁকে রেখে দেয়। সেই ভবিষ্যৎই মানুষের কর্মজীবনে নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে যায়। তবে বিধাতাপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও দেবদেবীর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভগবানকে স্বতন্ত্র দেহধারী কোন অস্তিত্ব রূপে আমরা মানি না। ভগবান প্রকৃতপক্ষে নিরাকার। নির্গুণ (viod)-কে ভগবান বলা হয় কারণ তিনি ভগের অধিকারী। ভগ হল যোনি বা শক্তি (kinetic energy)। এই ভগ শূন্যতার মধ্যে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে। যখন এই ভগ বা শক্তি শূন্যের মধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকে তখন অবিচলিত নীরবতা। ভারতীয় তত্ত্বে এই অবিচল নীরবতাকেই ব্রহ্মণ বা পরাত্মনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শক্তি যখন তার নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী নড়ে ওঠে তখনই জগৎ বা spherical universe (কিছুটা elliptical ভঙ্গীতে) ফুটে ওঠে। অধুনা, বিজ্ঞান এই ধরনের এক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে, যার নাম vacuam fluctuation in quantum field. আমাকে এ তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন পদার্থ বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এক

বিজ্ঞান শিক্ষক। দেশে (space-এ) জগৎরহস্যের যে বিচিত্র খেলা চলেছে কখনও তাতে একমেবাদ্বিতীয়ম অবস্থা হলেও আবার দ্বৈতের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থাটাই বোধ হয় রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অবস্থাটা গভীরভাবে বিচার করতে গেলে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্ব দাঁড়াতে চায় বটে কিন্তু চিরকালীন একটা দ্বৈত সত্তা স্বীকৃত হয় না। এক্ষেত্রে শংকরের অদ্বৈতবাদ সত্য বটে, তাই বলে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' একথা গ্রাহ্য নয়। ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত যে জগৎ তা মায়ারূপে প্রতিফলিত হলেও যেহেতু তা সত্যে স্থিত শক্তি থেকে উদ্ভূত, তাই তা মিথ্যা হতে পারে না। জগৎ অদৃশ্য হলেও শূন্যে সুপ্তভাবে থাকে। শূন্যে সুপ্তভাবে থেকে আবার প্রকাশিত হয় বলে তার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়ে যায়, তা নয়। বীজের মধ্যে যেমন মহীরূহ থাকে শূন্যের মধ্যেও তেমনই জগৎ থেকে যায়। বীজের মধ্যস্থিত অদৃশ্য মহীরূহ যেমন তার গুণস্বরূপ, জগৎও তেমনই ব্রহ্মের গুণস্বরূপ। ফুটে উঠলে দেখা যায়, না ফুটে উঠলে সুপ্ত থাকে। তাঁর অস্তিত্ব যে থাকে না তা নয়। আর জগৎ যদি মিথ্যে হয় তাহলে শংকরের কথাও মিথ্যে, এই কারণে যে, জগতের অংশ হিসেবে শংকরও মিথ্যে। মিথ্যে থেকে উদ্ভূত বাক্যও মিথ্যে। বরং শংকরের কথাটাকে এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে, যেমন 'ব্রহ্ম নিত্য জগৎ অনিত্য। নিত্য হল void। void-স্থিত সুপ্ত শক্তি কখনও ফুটে ওঠে, কখনও লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ void-এ সুপ্ত (Latent) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার ফুটে উঠে জগৎ (গতিশীল) রূপ ধারণ করে। void-এর অর্থাৎ অনন্তের বুকে সুপ্ত শক্তির এই যে নিত্য লীলা এর স্বরূপ যোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেন না।

নজরুলের লেখাতেই বোধ হয় একটি গান শোনা যায়,—'ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, এদেহে অসীম নীলাম্বর।' যোগ-

সাধনা মানুষকে নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে শিখিয়েছে। যখনই সে নিজের অন্তরের দিকে তাকাবার অবকাশ পেয়েছে, তখনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, দেহটা ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও আসলে ক্ষুদ্র নয়। সীমার মধ্যে অসীম লুকিয়ে রয়েছে।

সীমার মধ্যে অসীমের এই আত্মগোপনের ব্যাপারটি আমরা অত্যন্ত সহজে বুঝে থাকি একটা পেঁয়াজকে চোখের উপর রেখে। একটা পেঁয়াজকে যদি শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যায়, এবং তারপর একে একে তার খোলস বা আবরণ খুলে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শেষ আবরণটুকু সরে গেলে ভেতরে আর কিছু নেই। রয়েছে সেই void। তখন বাইরেও void ভেতরেও void। তখন দুই viod-এ মিলে গিয়ে আবরণের সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যায়। কবি একথা লক্ষ্য করেই লিখেছেন 'শূন্যে শূন্য মিলাইল।'

মানুষের এই দেহটাও একটা পেঁয়াজের খোলার মত। তার বাসনা-কামনার তীব্রতার হেরফের হেতু খোলাগুলি পুরু এবং সূক্ষ্ম। যত অভ্যন্তর তত বাসনার স্তর সূক্ষ্ম, যত বহির্দেশাভি-মুখী ততই তা স্থূল। পেঁয়াজের খোলার মত এই আবরণগুলি তাকে জড়িয়ে রেখেছে। পেঁয়াজের এক একটা স্তর খুললে স্তরে স্তরে রঙ পাল্টায়। মানুষ যত তার ভেতরে ঢুকতে পারে ততই তার স্থূল আবরণ সরে গিয়ে সূক্ষ্ম আবরণ দেখা দেয়। পেঁয়াজের এক এক আবরণের যেমন বর্ণভেদ আছে তেমনই মানুষ যতই তার ভেতরে প্রবেশ করে ততই নিজের ভেতরে বর্ণের তারতম্য দেখতে পায়। নিজের ভেতরেই নানা রঙের খেলা দেখে সে আশ্চর্য হয়। এই রহস্যময় অন্তর্জগৎ দেখতে পেয়েই অনেক যোগী বলে উঠেছেন, মানুষের দেহ একটা 'রঙের বাক্স'। সেই রঙ-বেরঙের বিচিত্র জগতে যে মানুষ প্রবেশ করে অনেক রহস্যময় জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তার রহস্যময় অনুভূতিকে তখন সে নানা প্রতীকময় ভাষাতে প্রকাশ

করে, কারণ পরিচিত বাচনভঙ্গী দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার সে যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারে না। তা ছাড়া নানা অদ্ভুত প্রতীকের মাধ্যমেও দিব্য জগৎ তাঁকে বিভিন্ন ধরনের ইঙ্গিত দেয়। সেই প্রতীকের অর্থ সূক্ষ্মভাবে ধরা গেলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায়। ভুল হলে উল্টো ফল। যেমন, প্রাচীনকালে পারশ্য যখন এথেন্স আক্রমণ করে তখন এই আক্রমণের পরিণতি কি হতে পারে তা জানার জন্য এথেনীয়রা ডেলফিতে দৈববাণী শোনার জন্য গিয়েছিল। সেখানে দৈববাণী হয়েছিল, 'Athence would be destroyed except the wooden wall.' অর্থাৎ কাঠের দেয়াল ছাড়া বাকী এথেন্স ধ্বংস হবে। এথেন্স শহরের চতুর্দিকে সত্যি সত্যি কাঠেরও দেয়াল ছিল। ডেলফির ভবিষ্যদ্বাণীতে যাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল তারা এই দৈববাণীর বাক্যার্থ ধরে নিয়ে এথেন্সেই থেকে গেলেন, কাঠের দেয়ালের পেছনে আশ্রয় নিলেন। এথেন্সে তখন রাষ্ট্র নেতা থেমিস্টোক্লিস। তিনি আদেশ দিলেন, সবাই নৌকোতে গিয়ে আশ্রয় নাও। যারা দৈববাণী অপেক্ষা রাষ্ট্রবাণীতে বেশি আস্থাশীল ছিলেন তারা নৌকোতে উঠলেন। ইতিমধ্যে পারশ্য বাহিনী এথেন্স আক্রমণ করল। কাঠের দেয়াল তাদের ঠেকাতে পারল না। এথেন্স ধ্বংস হল। যারা কাঠের দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা মারা গেলেন। কিন্তু এথেন্সের নৌ বাহিনীর কাছে পারশ্যের রণবহর ধ্বংস হয়ে গেল। পারশ্য ফিরে যেতে বাধ্য হল। প্রশ্ন হল, তাহলে কি ডেলফির দৈববাণী মিথ্যে হল? বাচ্যার্থে তা মিথ্যা হল, কিন্তু ভাবার্থে সত্য হল। কাঠের তৈরী জাহাজই এথেন্সের স্বাধীনতা রক্ষা করল। যা রক্ষা করে তা দেয়ালতুল্য। সুতরাং ভাবার্থে কাঠের রণবহরই ছিল দেয়ালতুল্য। দৈবী-ভাষা এমনই প্রতীকময় (Symbolical) ও ইঙ্গিতবহ (Suggestive) হয়। কারণ অতীন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকে সরাসরি তথাকথিত ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

ডেলফির দৈববাণীর মত সাধকের অন্তরমথিত সেই প্রতীকময় ভাষা যখন নিঃসৃত হয় তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাচ্যার্থ দিয়ে তখন তার যথার্থ অর্থ ধরতে পারেন না। কাঠের দেয়ালকে যারা কাঠের দেয়াল বলেই ভাবেন তারা এথেন্সের মূর্খ নাগরিকদের মতই ভুল করেন। ব্যাখ্যার নামে তারা নানা আবোল-তাবোল বকতে থাকেন। এরকম একটা অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেদিন আমাদের একটি গল্পের চলচ্চিত্র প্রযোজকের (producer) বৈঠকখানায়। তখন তাঁর একটি নতুন চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করছে। চিত্রটির নাম লালন ফকির। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সুরে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে নানা রহস্যময় গান আছে film-টিতে। ক্যাসেটে গানগুলো বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন চলচ্চিত্রকার। গানগুলোর মধ্যে একটি গান ছিল এই ধরনের—'ঘরের কাছে আর্শিনগর দেখতে পেলাম না।' অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলাম—'গানটির অর্থ করতে পারেন?' কেউ অর্থ করতে পারেননি। এমন কিছু হিব্রু ভাষায় লেখা নয় যে এর অর্থ বোঝা যাবে না। বাচ্যার্থ অত্যন্ত সহজ, কিন্তু ভাবার্থ কঠিন অপেক্ষাও কঠিন।

মরমিয়া সাধক, যাঁরা নিজের অন্তর্জগতে ডুব দিয়েছেন তাঁরা এরকম অনেক রহস্যময় অনুভূতিকেই প্রতীকী ভাষায় রূপ দিয়েছেন—যেমন, রামপ্রসাদ সেন। একজন প্রথিতযশা শাক্ত পণ্ডিতকে রামপ্রসাদ সেনের এই গানটির অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম—'এবার কালী তোমায় খাব।' তিনিও এর ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে জানতে চেয়েছিলাম মীরার—'জ্যোতিসে জ্যোতি মিলাও'-এর অর্থ। তিনিও কিছু বলতে পারেন নি। ভগবদ্গীতার উপর বিশিষ্ট এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: গীতার এই শ্লোকটি আমায় বুঝিয়ে দিন তো?

'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।'

তিনি একটি পণ্ডিতের ভাষ্য কণ্ঠস্থ করেছেন কিন্তু এর অর্থ বোঝেন নি।

সাউথপয়েন্ট স্কুলের বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষক, যথার্থ পণ্ডিত, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, তিনটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জনৈক বন্ধু কলেজস্ট্রীটের টেমার লেনে করুণা প্রকাশনীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে দেহতত্ত্বের একটি গানের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন—'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি?' আমি তাঁকে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, যা বর্তমান অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। আর এক ভদ্রলোক আরও একটি জটীল প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন দেহতত্ত্বের গান থেকে: 'মেয়ের বুকে মা জন্মালো।' এর প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছিলাম। তন্ত্রের এক গূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে গানটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তন্ত্রেও ঠিক একই অর্থবহ একটি কথা আছে—'কালী রমণী, তারা জননী।' এসবই হল অন্তর জগতের মরমিয়া ভাষা, প্রতীকময়, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাময়। অভিধান থেকে মধুসূদন দত্তের মত দুরূহ শব্দ সংগ্রহ করে সংযোজনা নয়, বা সুধীন দত্তের মত সচেতন চেষ্টায় কঠিন শব্দের প্রয়োগ নয়। এ অত্যন্ত সাদামাটা কথার গান। কিন্তু অর্থ হল দুর্গম। আসলে সব মরমিয়া কবিরাই অত্যন্ত নিরাভরণ সহজ ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তার চিত্রকল্প এত ইঙ্গিতময় যে, হিব্রু ভাষা ভেদ করার চাইতেও তা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে দুরধিগম্য সেখানেই যেখানে তিনি বাচন-ভঙ্গীতে নিরলঙ্কার ও সহজ, যেমন 'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই' এর মধ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষা অলংকরণ তেমন কিছু নেই। উপমাদি যা আছে তা তাঁর 'বিদায় অভিশাপ'-এর মত সহজ কবিতাতে, যেমন:

'হাসি ? হায় সখা এতো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।'

এই সামান্য কবিতাংশটির তুলনায় পূর্বোক্ত কাব্যাংশটি অত্যন্তই নিরাভরণ। অথচ ভাবের গভীরতায় প্রথমটি প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। দ্বিতীয়টি বস্তুজগতের সীমানা দ্বারা বাঁধা। একটি রহস্যময় অন্তরানুভূতি থেকে উদ্ভূত, অপরটি কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব অলংকারের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয়টি পণ্ডিত ব্যক্তির জন্য প্রথমটি মরমিয়া সাধকের জন্য। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মরমিয়া, যেখানে তিনি যত নিরাভরণ, সেখানে তিনি তত রহস্যময়, তত কঠিন, তত অতলান্ত সমুদ্রের অতল তল। যেমন, অতি সহজ এই গানটিই—'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে হতে সংশয়, জয় অজানার জয় অত্যন্ত কঠিন।'

ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সবগুলিই এই অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্য থেকে আহরিত বাক্যসম্পদে সজ্জিত। সুতরাং এর বাচ্যার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে সহজ হলেও ভাবার্থ দুরধিগম্য। এক্ষেত্রে অপরের ভাষ্য, এমনকি সাধকের ভাষ্যও তাঁর কাজে লাগবে না। কারণ, সে ভাষ্যও বোঝার ক্ষমতা টোল চতুষ্পাঠী বা ইংরেজী বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা কোন পণ্ডিতের নেই। এ ভাষা বুঝতে পারেন মরমিয়া এই জগতে যাঁরা ঘোরাফেরা করেন শুধু তাঁরাই। এর বিদ্যায়তন আলাদা। এখানে নিরক্ষরও স্বাক্ষর। সেই-জন্যই চণ্ডীর উপর অথরিটি এমন এক পণ্ডিতকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন তো ঃ

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি ॥
যে মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥'

তিনি এর বাচ্যার্থ গড় গড় করে বলে গেলেও ভাবার্থ সামান্যও করতে পারেননি। রসিকচন্দ্র রায়ের এই গানটিও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যখন গভীরভাবে এর অর্থ তাঁরা ভাবতে বসেন,

'আয় মা সাধন সমরে
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।'

এ-সব কথা যে আমরা অহংকার করে বলছি, তা নয়। আসলে যে দিব্য জগতের কথা আমরা বলতে যাচ্ছি রহস্যময়ভাবে একদিন সেই দিব্য জগতের ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়াতে যতটুকু সে অঞ্চলে প্রবেশ করতে পেরেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি, এ-সব বস্তুগ্রাহ্য জগতের পাণ্ডিত্যের কোন ব্যাপার নয়। এ জগতে প্রবেশ করতে পারলে সঙ্কেতময় সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের অর্থই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন আর কোন অহংকারই থাকে না। থাকে তাঁকে বোঝার এক অপার আনন্দ। আর সেই আনন্দ ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে দশজনের সঙ্গে, তাদের বুঝিয়ে। বরং যতদিন এ জগতে প্রবেশ করতে পারিনি ততদিনই ছিল অহংকার।

অহংকার এবং যথার্থ জ্ঞান-এর মধ্যে পার্থক্য কি এ নিয়ে একটি সুন্দর গল্প শুনেছিলেন লেখক তারকেশ্বরের দুটি কলেজ-ছাত্রের কাছে। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় সেবার বর্তমান লেখক তৃতীয়বার বক্তৃতা দিয়ে ফিরছেন। বক্তৃতার বিষয় গীতারহস্য। বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে দেখেন দুটো ছেলে পেছনে পেছনে আসছে। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ?

ওরা বলল, স্যার দয়া করে ঠিকানাটা দেবেন ?

—কেন ?

—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব ?

—কি আলোচনা ?

—অধ্যাত্ম বিষয়ে।

—অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনা তো সাধুসন্তদের কাছে শুনবে? অনেক সাধুসন্ত তো এখানে বক্তৃতা দিলেন?

ওরা বলল, তাঁদের বক্তৃতাও শুনেছি, কিন্তু ওঁদের কাছে যাইনি।

—কেন?

—আমরা যা চেয়েছি সেখানে তা নেই।

লেখক বললেন, আমার কাছে তো তাহলে আরও কিছু পাবে না।

ছাত্র দুটি বলল, স্যার আমরা দীক্ষিত। সৎগুরুর কাছেই দীক্ষা পেয়েছি। কোথায় সার আছে, কোথায় নেই, তা অন্তত বুঝতে পারি। এখানে সাধুসন্তেরা বক্তৃতা দিলেন অধীত বিদ্যার উপর, অর্জিত জ্ঞানের উপর নয়। এ বিষয়ে আমাদের গুরুর এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

ছেলে দুটি যে গল্প বলল, তা এই রকম: ভারতীয়-অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপর তাঁদের গুরু একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জনৈক পণ্ডিত অধ্যাপকের হাতে পড়ে। এ বিষয়ে তর্ক করার জন্য সেই অধ্যাপকটি একদিন তাদের গুরুর কাছে এসে হাজির। নানা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বিরাট এক তর্কের অবতারণা করলেন পণ্ডিতটি। বহু কথা বললেন। কিন্তু ছাত্র দুটির গুরুদেব চুপ করে থাকলেন। অনেকক্ষণ বক্‌বক্‌ করার পর পণ্ডিত ব্যক্তিটি লক্ষ্য করলেন যে, গুরুদেব একটিও কথা বলেন নি। তিনি বললেন, আমি তো অনেক বললুম, এবার অপনি কিছু বলুন?

গুরুদেব বললেন, এতক্ষণ তো আপনি অপরের কথা বললেন, এবার নিজের কথা কিছু বলুন। তারপর আমার কথা বলছি।

পণ্ডিত ব্যক্তিটির হুঁশ হল। সত্যিই তো অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে অপরের অভিজ্ঞতার কথাই তিনি জানেন, এক্ষেত্রে তাঁর

নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি লজ্জা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তর্ক বন্ধ করে মাথা নোয়ালেন।

আসলে অধ্যাত্ম জগতে গ্রন্থপঠনের কোন মূল্য নেই, যদি না স্বয়ং এ জগতে প্রবেশ করা যায়। বস্তুত বর্তমান লেখকও এ জগৎ নিয়ে কখনও কোথাও বক্তৃতা দেবার বা বলবার বা লেখবার কোন ঔদ্ধত্যই দেখান নি—যতক্ষণ না ছাড়পত্র পেয়ে এ জগতের এক সামান্য অংশেও প্রবেশ করতে পেরেছেন।

বর্তমান লেখকের অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের ইতিহাসও রীতিমত বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। এ জগতে সামান্য একটু প্রবেশ করার পরই দেখা গেছে, এর বহু তত্ত্ব আপনিই যেন উদ্ভাসিত হতে থাকে। শাস্ত্রে লিখিত ভাষা আসলে এক ধরনের প্রতীকী ভাষা, সংকেত-ময় ভাষা। সে ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ এ জগতে প্রবেশ না করলে কখনই স্পষ্ট হয় না। বস্তুগ্রাহ্য তর্কশাস্ত্রের নিরিখে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ প্রকাশিত হবার নয়। এ-জন্য পশ্চিমী মেটা-ফিজিক্স এ জগতের প্রান্তভাগে ঘোরাফেরা করলেও অতীন্দ্রিয় দুনিয়ার যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরতে পারে না। এইজন্যই মেটা-ফিজিক্সের চাইতে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা অনেক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিগণ নিজেরা আত্মচেতনায় অধ্যাত্মজগতের আঙিনায় প্রবেশ করে এর যথার্থ স্বরূপ চৈতন্যসত্তায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অধ্যাত্মজগতের অভিজ্ঞতা এমন রহস্যময় যে, বস্তুগ্রাহ্য ভাষা দিয়ে তার যথার্থ রূপরেখা অংকন করা যায় না। সেইজন্য প্রতীকময় ভাষায় এবং প্রতীকী গল্পে এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ। একটা ছোটখাটো মানুষ সমুদ্র শোষণ করে ফেলবেন তা সম্ভব নয়। এ ধরনের গল্প গাঁজায় দম দিয়ে তবেই কোন লেখক লিখতে পারেন। আসলে এ হল জীবাত্মার সীমিত বোধ হারিয়ে অনন্ত হওয়া, নিজের মধ্যে অনন্তকে ধারণ করা—

অর্থাৎ নিজেই অনন্ত হওয়া—যে 'অনন্ত' আবরণের সীমার মধ্যে তার নিজের অভ্যন্তরেই রয়েছে, যে কথা মনে রেখে নজরুল লিখেছিলেন—'ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর, এদেহে অসীম নীলাম্বর।' পেঁয়াজের খোলা ছাড়িয়ে নিলে ভেতরকার শূন্য যেমন বাইরের শূন্যের সঙ্গে এককার হয়ে যায় সেই রকম, অর্থাৎ পেঁয়াজের ভেতরকার শূন্যতা অনন্ত শূন্যতাকে গ্রাস করে অর্থাৎ আত্মস্থ করে। অর্থাৎ নিজের অসীমত্ব উপলব্ধি করে।

নিজস্ব কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে অধ্যাত্ম প্রতীক ব্যঞ্জনার কোন স্বরূপ ধরা যায় না। উপরোক্ত যে-সব গানের কথা আমরা বলেছি সে সবই অধ্যাত্ম জগৎ থেকে আহরিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতীকময়রূপ। সেই অধ্যাত্মজগতের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে এই সব প্রতীকী ব্যঞ্জনার স্বরূপ প্রকাশিত হবার নয়। বাক্যার্থে কথাগুলির অর্থ এক, ভাবার্থে আর এক। ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মত অষ্টাদশ পুরাণও প্রতীকী কাহিনী মাত্র, সঙ্কেতময় রূপ। শাস্ত্রবাক্যের মত এরও ভাবার্থ প্রকাশিত না হলে গল্পগুলি অধিকাংশই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। এই সব বাক্যার্থ ও ভাবার্থে ভেদ কি উপরোক্ত গানের কলিগুলির ভাবার্থ বর্ণনা করে তা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। এবং পরমাত্মার স্বরূপ কি? তাঁর বুকে মানুষের চিন্তাতরঙ্গ কিভাবে প্রতিফলিত থাকে তা ব্যাখ্যা করছি।

আমাদের ফিল্ম প্রডিউসার মহাশয়ের বৈঠকখানায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে লালন ফকিরের গান দিয়ে অধ্যাত্মজগতের যে প্রতীকময়তার কথা আমরা বলতে যাচ্ছিলাম এবার তার ব্যাখ্যায় যাচ্ছি। তবে এ ব্যাখ্যার স্বরূপ বুঝতে হলে দেহতত্ত্ব বোধ আগে থাকা প্রয়োজন। আগে সেই দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জানিয়ে নিচ্ছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগৎতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব

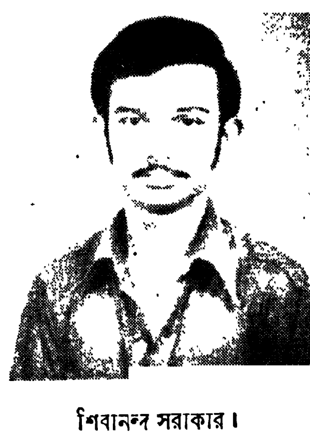
দেহতত্ত্ব বুঝতে হলে আগে বিশ্বতত্ত্ব বা জগৎতত্ত্ব জানা প্রয়োজন। যেভাবে জগৎ তৈরী হয়েছে ঠিক সেইভাবেই মানুষের দেহও তৈরি। শুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ, জড়-অজড় সবই সেই একই পদ্ধতিতে সৃষ্ট।

বিজ্ঞান জগৎ উৎপত্তির বিশেষ স্বরূপ কি সে বিষয়ে আজও ওয়াকিবহাল নয়। এ নিয়ে আজকাল দুটি অভিমত খুবই জোরদার, যেমন 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্ব ও 'স্টেডি স্টেট' তত্ত্ব। বিগ ব্যাঙ তত্ত্বের মূল কথা দেশে (space) কোথাও একত্রে ঘনীভূত হয়ে থাকা বস্তুকণা ছিল (Masses)। সম্ভবত সেই বস্তু-কণাতে অতিরিক্ত সংকোচনের ফলে কেন্দ্রে উত্তাপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ঘনীভূত বস্তুকণার মধ্যে কম্প্রেসনের ফলে উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলে কেন্দ্র থেকে বস্তুকণাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে গোলাকার ভাবে (in spherical way)। এইভাবেই গোলাকার জগতের সৃষ্টি হয়েছে। একটা কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণজনিত বেগের ফলে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে—এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে—যদি জগতের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন এক বিশেষ কেন্দ্র থেকে বস্তুজগৎ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সরে যাওয়ার গতিও প্রচণ্ড—প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল। বস্তুজগৎ এই ক্রমশ ব্যাপ্তির জন্য কেন্দ্র এবং পরস্পর থেকে যেভাবে সরে যাচ্ছে তা একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা, যেমন একটি ব্লাডার। ব্লাডারের গায়ে অনেকগুলি ফুটকি দিয়ে—তাকে ফুলালে যেমন ফুটকিগুলো কেন্দ্র ও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় জগৎও



সবিতা সরকার, ১৭১/২ সি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯





শিবানন্দ সরাকার।

…কা, মহীতোষ ও স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায়।



মনের জোরে উরি গেলার (Uri Geller) চামচ বাঁকিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে এর মধ্যে কারসাজি আছে ব'লে মনে করেন।

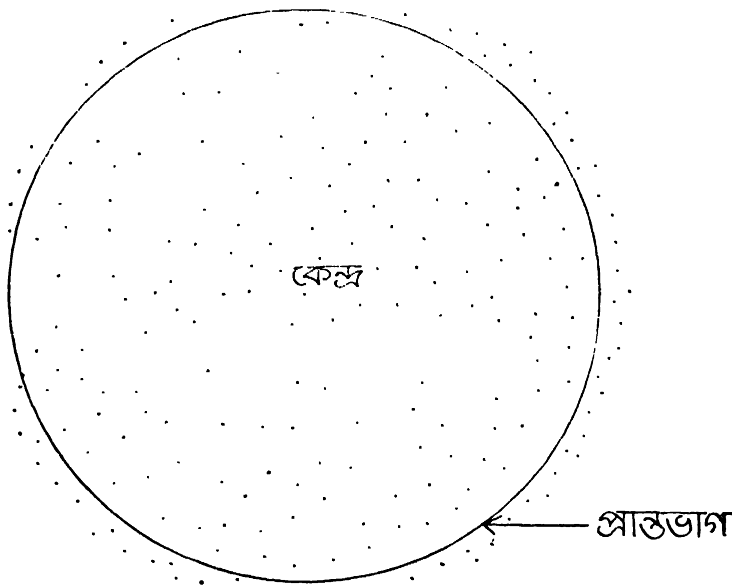


ফরাসী চিকিৎসক হিপোলাইট (Hippolyte Bara due) কর্তৃক তোলা মৃতদেহ থেকে নিসৃত আত্মার উপাদানের ছবি। দক্ষিণ দিকে ফটোটি তাঁর পত্নীর মৃত্যুর পনের মিনিট পরে, মাঝের ছবিটি মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে এবং বাম দিকের ছবিটি পুত্রের মৃত্যুর নয় ঘণ্টা পরে তোলা।



উইলিয়ম হোপ কর্তৃক তোলা জীবাত্মার ছবি। হ্যারি প্রাইস ছবিটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পাবনার বিখ্যাত পাকড়াশী পরিবারে এরকম এক ফটো তোলার ঘটনার কথা শোনা যায়। উপরোক্ত ফটোটি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন শহরাঞ্চলে গৃহীত ছবি

তেমনি কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফুটকিগুলো যেমন পরস্পর পরস্পর থেকে সরে যায়, তেমনই জগতের গ্রহ নক্ষত্রও সরে যাচ্ছে। চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ



এই বিগব্যাঙ তত্ত্ব অনুসারে বিস্ফোরিত গোলাকার জগৎ বিজ্ঞানেরই এক নিয়ম (কোয়াণ্টাম তত্ত্ব) অনুসারে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হচ্ছে। যত দিন বিস্ফোরণজনিত এই আবেগ থাকবে তত দিনই কেন্দ্র থেকে জগতের বৃত্তমণ্ডল ক্রমশই দূরে সরে যাবে। কিন্তু বিস্ফোরণজনিত বেগ কমে এলেই উল্টো টান পড়বে। তখন প্রচণ্ড গতিতে ছড়িয়ে পড়া বিশ্বজগতের গ্রহ নক্ষত্র—ইত্যাদি কেন্দ্রের দিকে ধাবমান হবে। মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে যাবে, বস্তুজগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সবেগে কেন্দ্রে গিয়ে জড় হয়ে অভিকর্ষের টানে যখন তা বেশি রকম ঘনীভূত হতে থাকবে তখন

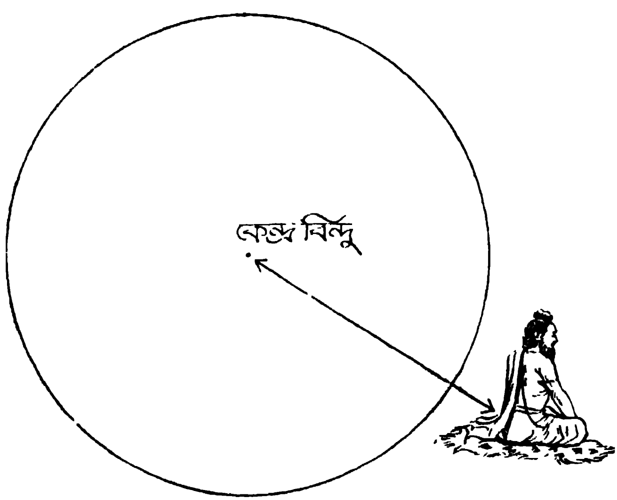
আবার হবে কম্প্রেশন। ফলে সেই প্রচণ্ড চাপে কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটাবে। আবার জগৎ সৃষ্টি হবে। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র এই ধরনের ঘটনাকে বলেছে সংস্কারের অভিঘাত। সংস্কার অর্থাৎ বস্তুজগতের সূক্ষ্ম উপাদান কেন্দ্রীভূত হয়ে আবার ইচ্ছার উত্তাপে বিস্ফোরিত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করবে।

কিন্তু বিগব্যাঙ তত্ত্ব দুটি কারণে এখন অস্বীকৃত হচ্ছে। একটি হল এই যে, যদি কেন্দ্রস্থিত কোন ঘনীভূত বস্তুকণা কম্প্রেশনজনিত তাপে বিস্ফোরিত হয় এবং কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে ছড়িয়ে পড়ে তা হলে কেন্দ্রের যে শূন্যতা তার পরিধি ক্রমশ বাড়তে থাকবে। কিন্তু সে রকমটি ঘটছে না বলেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। তা ছাড়া ইদানীং সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রীভূত কোন বস্তুকণা সমূহ (Masses) ছাড়াই শূন্যের বুকে বিস্ফোরণ হতে পারে। শূন্যের মধ্যে বৃত্তাকারে থাকা শক্তি—স্বভাবগুণে নড়ে উঠে জগৎ তৈরি করে, আবার স্বভাবগুণেই লয়প্রান্ত হয়। মহাশূন্যের বুকে অনবরত এই খেলা চলেছে। Vacuam Fluctuation in Quantum Field তত্ত্ব একথাই বলে।

ফলে নতুন এক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যাকে বলে স্টেডি স্টেট থিওরি। এই তত্ত্বের মতে বিশেষ কেন্দ্রে অনবরতই সৃষ্টি হচ্ছে। অনবরতই তা ছড়িয়ে পড়ছে। এই জন্য সম্প্রসারণশীল জগতের কেন্দ্র ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে না।

ভারতীয় তন্ত্রতত্ত্ব গ্রহণ করলে এই স্টেডি স্টেট থিওরিকেই স্বীকার করে নিতে হয়। এবং এর পক্ষে দাঁড়ায় বিন্দুতত্ত্ব। সে সাধক বিন্দু ধ্যান করেন তিনি বিন্দুর অন্তস্থিত শূন্যতায় চেতনাকে নিস্তরঙ্গ না করা পর্যন্ত অনবরত চোখের সামনে এই বিন্দু অথবা জ্যোতি দেখতে পান। এই বিন্দু আর কিছুই নয় শূন্যস্থিত সুপ্ত শক্তির স্বভাবে বিস্ফোরিত

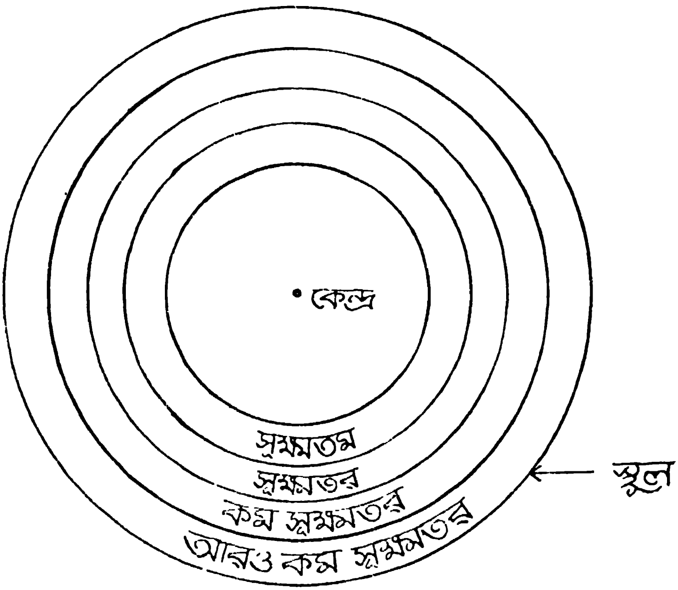
হওয়া জনিত তেজোদীপ্তি। কারণ আমরা জানি যে, বিস্ফোরণ হলেই আলো ফুটে ওঠে। এই বিন্দু সেই বিস্ফোরণ জনিত আলো। একে এত ছোট দেখা যায় এই কারণে যে, বিন্দু থেকে বহু দূরে সাধক অবস্থান করেন। কিন্তু মূলত এই বিন্দু অনেক বড়। ছোট দেখা যায় এই কারণে যে, আমরা এর কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকি। যেমন সূর্য অনেক বড় হলেও তাকে ছোট দেখি এই কারণে যে, তার থেকে আমরা অনেক দূরে আছি। কিন্তু কেউ যদি সূর্যের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে আর সূর্য দেখবেন না, দেখবেন শুধু আলো বা জ্যোতি। সাধকও যদি তাঁর চেতনাকে বিন্দু পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে বিন্দু দেখেন না, দেখেন শুধু জ্যোতি, জ্যোতি আর জ্যোতি। আরও এগুলে বিন্দুস্থিত শূন্যতার মধ্যে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনাটি কিভাবে ঘটে দেহতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তা বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে সাধক ও বিন্দুর অবস্থান কি ধরনের ডায়াগ্রাম এঁকে—তাই দেখানো হচ্ছে ঃ



সাধক ও বিন্দু

বিগব্যাঙ তত্ত্ব ও স্টেডি স্টেট তত্ত্ব কিংবা ভারতীয় তন্ত্র তত্ত্বই হোক—কেন্দ্র থেকে জগতের যে-ভাবে উদ্ভব হয়, তার প্রথম দিকে থাকে সূক্ষ্ম অবস্থা। যতই তা কেন্দ্র থেকে দূরে সরে আসে ততই পায় স্থূলাবস্থা। এই সূক্ষ্মাবস্থা ও স্থূলাবস্থা হয় বিস্ফোরণজনিত তরঙ্গ বা ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্য অনুযায়ী। ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্য অনুযায়ী যে এক এক অবস্থা হয় রঙের তারতম্যই তা চমৎকারভাবে প্রকাশ করে। শব্দের শ্রেণীবিভাগও এর সপক্ষেই প্রমাণ দেয়। রঙের ক্ষেত্রে লাল, হলুদ, সাদা, নীল, বেগুনী ইত্যাদি রঙ বস্তুত ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্য হিসেবে। শব্দও ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্য হিসেবে সূক্ষ্ম বা স্থূল হয়। সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির আলো যেমন স্থূল চোখে অদৃশ্য, সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি বা কম ফ্রিকোয়েন্সির শব্দও তেমনই স্থূল কর্ণে অশ্রুত। এ থেকে সুপারসনিক ও সাবসনিক শব্দ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। স্থূল যন্ত্রে যে আলো ধরা পড়ে না সূক্ষ্ম যন্ত্রে সে আলো ধরা পড়ে। তেমনি স্থূল যন্ত্রে যে শব্দ ধরা পড়ে না সূক্ষ্ম যন্ত্রে সে শব্দ ধরা পড়ে। তেমনই স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখা যায় না সূক্ষ্ম দৃষ্টি হলে তা দেখা যায়। এবং এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা শ্রুতি মানুষের মধ্যে কিভাবে সম্ভব তা দেহ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার সময় বোঝাচ্ছি। এখন তন্ত্রতত্ত্বে জগতের সূক্ষ্ম ও স্থূলতা, বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের প্রথম দিকের বৃত্তগুলিতে সূক্ষ্ম অবস্থা থাকে। অণু সৃষ্টি হয়ে সেই সূক্ষ্মতা স্থূলতাপ্রাপ্ত না হলে স্থূল কিছু চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সূক্ষ্ম যন্ত্রে সেই সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে। যেমন মানুষের দেহের উপর সূক্ষ্ম নানাবর্ণের আলো আছে স্থূল চোখে তা ধরা পড়ে না কিন্তু রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা এক ধরনের ফটো তুলে সেই আলোকে ধরে ফেলেছেন। এই ফটোগ্রাফি কিরলিয়ান বা কার্লিয়ান ফটোগ্রাফি নামে পরিচিত। (ব্যাক কভারে আর্ট প্লেটে এই ছবি দ্রষ্টব্য)

এই কার্লিয়ান ফটোগ্রাফির মত জগতেরও প্রাথমিক বৃত্তপর্যায়-গুলি সূক্ষ্ম। প্রান্তভাগের বৃত্তই একমাত্র স্থূল। বীজের মধ্যে মহীরুহের মত এই সূক্ষ্ম পর্যায়ে জগতের উপাদান লুকিয়ে থাকে। জগতের সূক্ষ্ম ও স্থূল পর্যায় এই ধরনের ঃ



সূক্ষ্ম পর্যায়ে ঘনীভূত বস্তু নেই, আছে বর্ণরূপে তার অবস্থান। এক এক ধরনের বর্ণ হল এক এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা তৈরী। তন্ত্র এই জন্য সমগ্র বিশ্বজগৎকে বর্ণ দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করেছে। এই বর্ণ তন্ত্রের মতে একান্নটি। এক একটি বর্ণের এক একটি ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে আছে এক একটি ধ্বনি—সূক্ষ্মতর অবস্থা থেকে স্থূল পর্যায় পর্যন্ত। বর্ণের ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রতীকী রেখায় ধরার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা অক্ষর তৈরি করেছে। তন্ত্র মনে করে যে, জগৎ মূল কেন্দ্র থেকে কোয়াণ্টাম পদ্ধতি অনুসরণ করে একান্নটি বৃত্তে স্থূলতা লাভ করেছে। এক একটি

বৃত্তের এক এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে এক একটি প্রতীকী অক্ষর তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে সূক্ষ্মতম বোধে অনুভূত ঊর্ধ্ব আদি অক্ষর বাদে পঞ্চাশটি অক্ষর নিয়ে সংস্কৃত বর্ণমালা তৈরি হয়েছে।

এই কোয়াণ্টাম পদ্ধতিতে জগৎ তৈরির সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রের 'ওঁ' শব্দটি জড়িত। শূন্যে স্থিত সুপ্ত শক্তির স্বভাবজনিত বিস্ফোরণের প্রথম শব্দই ভারতীয় শাস্ত্রে প্রণব বা অ-উ-ম নাদ নামে খ্যাত। আদি পর্বে এই অ-উ-ম নাদ পরাশব্দ নামে পরিচিত। অর্থাৎ প্রাথমিক বিস্ফোরণাবেগ জনিত নাম—যা supersonic শব্দকেও হার মানিয়েছে। এই শব্দ শোনা যায় না। এই শব্দের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়। দ্বিতীয় স্তরের শব্দের নাম পশ্যন্তি। এ শব্দ বা frequency শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, আলো আকারে দৃষ্ট, যাকেই বলা হয়েছে বিন্দু। তৃতীয় পর্যায়ে এই শব্দ মধ্যমা নামে পরিচিত। সূক্ষ্ম শ্রুতি হলে দেহ-আকাশের মধ্যম স্তরে নিজের চেতনাকে তোলা গেলে যে শব্দ শোনা যায় সেই শব্দই অ-উ-ম নাদ হিসেবে সাধকের সূক্ষ্ম কর্ণে শ্রুত হয়। শেষ শব্দ স্থূল শব্দ—যার নাম বৈখরী, যা স্থূল কর্ণে শোনা যায়।


অণুর চিত্র

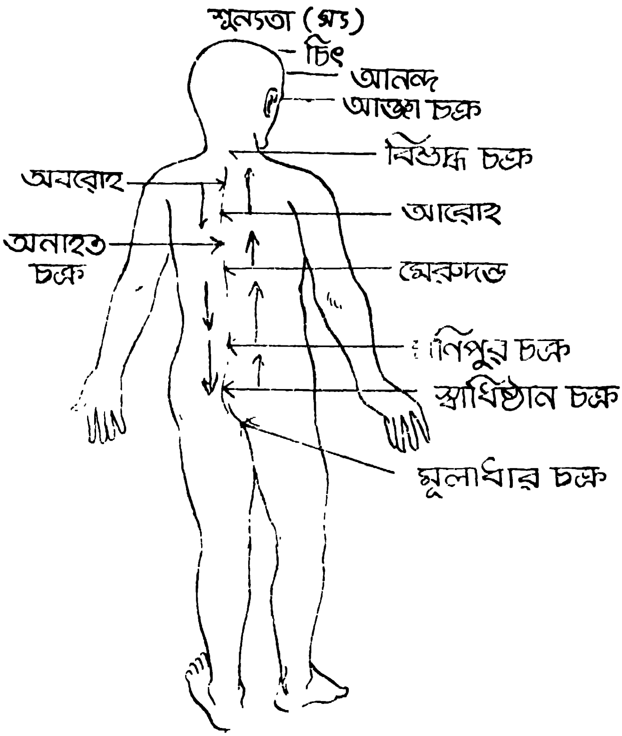
জগৎ সৃষ্টির এই যে ধারা, তা জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে—জীবে অজীবে সর্বত্র। এই জন্য অণুর একটি ফটোগ্রাফ দেখলে জগতের অনুকৃতি তাতে লক্ষ্য করা যায়।

এই অণুকে বিস্ফোরিত করলে জগৎ সৃষ্টির নিয়ম অনুসারেই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ একটি অণুর মধ্যে ক্ষুদ্র বিশ্ব ফুটে ওঠে—যাকে ইংরাজীতে বলা যায় Miniature Universe. একটি অণুর ভিতর যেমন জগৎ সৃষ্টিক্রিয়া এইভাবে ক্রিয়াশীল তেমনই প্রতিটি জীব ও মানুষের মধ্যে এই ধরনের সৃষ্টিরহস্য কর্মরত। মানুষের দেহতত্ত্বের সেই খবর জানা গেলেই মানুষের সূক্ষ্ম দর্শন, অনুভূতি ও শ্রুতির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মানুষের দেহে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত স্তরে স্তরে বিশ্বজগতের সূক্ষ্মতম ও সূক্ষ্মতর থেকে স্থূল পর্যায়ের উপাদান রয়েছে। ভারতীয় দেহতত্ত্বশাস্ত্রে ব্রহ্মরন্ধ্রকে ধরা হয়েছে শূন্যতা স্বরূপ। তার পরের স্তরেই রয়েছে বিস্ফোরণের আবেগজনিত অবস্থা। তার পর বিস্ফোরণজনিত আলো। ভারতীয় শাস্ত্রে একেই বলা হয় সৎ + চিৎ + আনন্দ। সৎ হল শূন্যতা, চিৎ হল বিস্ফোরণের আবেগজনিত বোধ এবং আনন্দ হল বিন্দু। এই বিন্দু বা বিস্ফোরণের আলো থেকে স্তরে স্তরে বিস্ফোরণজনিত কম্পন বা vibration নিচে নেমে এসেছে। বিশ্বসৃষ্টির মতই এই তরঙ্গ একান্নটি। মূলত তাকে সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে —দেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডস্থিত ছটি চক্র ও ব্রহ্মরন্ধ্রের নিকটস্থ সপ্ততল। সর্বোপরি রয়েছে চিৎ ও সৎ। এক একটি চক্র ও সপ্ততলে রয়েছে ৭টি করে আরও সূক্ষ্মতর পর্যায় অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৪৯টি পর্যায়। সর্বোপরি দুই পর্যায় নিয়ে ৪৯ + ২ = ৫১ পর্যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত সৃষ্টিক্রিয়া একটি দেহকে কেন্দ্র করে যেভাবে নেমে আসছে তা নিম্নরূপ : (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্যস্থিত সুপ্ত শক্তি ফুটে ওঠার আবেগ পাওয়া মাত্র তা বোধ অর্থাৎ 'আছি' এই বোধ সৃষ্টি করে। এই বোধই হল চিৎ বা চৈতন্য। শূন্যতা অবর্ণনীয়, কিন্তু চিৎ বর্ণনীয়। চিতের অবস্থা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। আনন্দের অবস্থা জ্যোতি-

পূর্ণ। এই জ্যোতি ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র অবধি নেমে আসার সময়—সূক্ষ্ম বর্ণরূপে স্তরে স্তরে নেমে আসে—অর্থাৎ যথার্থ



মানবদেহে শক্তির অবরোহ ও আরোহ পর্যায়

বর্ণের essence বা তন্মাত্র অবস্থায় নেমে আসে। এ হল বীজের মধ্যে মহীরূহের তন্মাত্র অবস্থায় থাকার মত। আজ্ঞাচক্রে এসে এই তন্মাত্র বর্ণগুলি বিস্ফোরণের আকারে অসংখ্য বর্ণদ্যুতি বিকিরণ করে। বিশুদ্ধচক্রে নেমে তা স্বচ্ছ নীলবর্ণ ধারণ করে। অনাহত পর্যায়ে এলে—আকাশের নীলিমার রঙ প্রাপ্ত হয়। মণিপুরে তা তেজোময় ধূম্রপুঞ্জের মত হয়। স্বাধিষ্ঠানে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। মূলাধারে লালবর্ণ হয়। তাত্ত্বিক তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে এর হয়তো মিল হয় না—কিন্তু যাঁরা ক্রিয়াযোগে অভ্যস্ত

তাঁরা চৈতন্যধৃত অভিজ্ঞতায় উপরোক্ত বর্ণগুলিই প্রত্যক্ষ করেন। বর্ণের এই প্রত্যক্ষকরণ অবরোহ পর্যায়ে হয় না, হয় আরোহ পর্যায়ে। এই পর্যায়ের স্বরূপ বুঝতে গেলে শক্তির স্বরূপও কিছুটা জানা দরকার।

শূন্যাস্থিত শক্তি আবেগজনিত কম্পনে বিস্ফোরিত হলে কেন্দ্র থেকে সম্প্রসারিত হয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। এই সম্প্রসারণ অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাওয়াকেই বলে অবরোহণ। মানুষের দেহে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নামতে নামতে এই শক্তি মূলাধারে এসে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন বিশ্বজগৎ একান্নতম পর্যায়ে কেন্দ্র থেকে দূরে সরে এসে বৃত্তের প্রান্তে স্থূলতাপ্রাপ্ত হয়। শক্তি স্থূলতা-প্রাপ্ত হয়ে মূলাধারে এসে ঘনীভূত হলে দেহযন্ত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রতিনিয়ত সেখানে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে যে তাপ উৎপাদন করে সেই তাপে দেহ জীবিত থাকে। মূলাধারের অবস্থান মলদ্বার ও লিঙ্গের মধ্যস্থানে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সেখানে এসে কিভাবে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে, যে কোন ব্যক্তি শ্বাসপ্রশ্বাস কালে গুহ্যদ্বারে হাত দিয়ে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন যে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় সেখানেও ওঠা নামা হচ্ছে। এটা হল অতি স্থূল পর্যায়ের ওঠানামা। এতে দেহকে জীবিত রাখার জন্য যতটুকু মূলাধারের সুপ্তশক্তিতে আঘাত করা প্রয়োজন ততটুকুই হয়। ফলে মানুষের চেতনা স্থূল পর্যায়ে থাকে। এই স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে এক এক মানের। জগতে যাঁরা মনীষী ব্যক্তি বলে পরিচিত তাঁদের এই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় মূলাধারস্থ সুপ্তশক্তিকে আঘাত হানার ক্ষমতা বেশি। সাধারণত সুপ্তশক্তির একশ ভাগের দশ ভাগ শক্তি এর ফলে জাগরিত হতে পারে, তার বেশি নয়। এই দশভাগ শক্তি যাঁদের জাগরিত হয় তাঁরা জগতে আইনস্টাইন শ্রেণীর চিন্তাবিদ হিসেবে বিশেষ মনীষী বলে গণ্য হন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই শক্তি দু, তিন, চার,

পাঁচ, ছয় ইত্যাদি শতাংশ ভাগে জাগরিত হয়। কিন্তু যাঁরা দেহ-তত্ত্বের কলাকৌশল জানেন এবং বায়ুর স্বরূপ বোঝেন, তাঁরা এই শক্তিকে আরো বেশি করে জাগরিত করে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াতে ঘুমন্ত মূলাধারস্থ শক্তি এনার্জি বিকিরণ করে, সেই স্থূল শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে সূক্ষ্ম করতে পারলে বায়ুর শক্তি আরো বেড়ে যায়। শক্তিশালী বায়ু তখন মূলাধারে দশ শতাংশ অপেক্ষাও অনেক বেশি শক্তি জাগরিত করতে পারে। বায়ুকে শক্তিশালী করার পদ্ধতির নাম প্রাণায়াম। প্রাণ অর্থাৎ বায়ু, আয়াম মানে নিয়ন্ত্রণ। যিনি শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন তিনি বায়ুর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেন। বায়ুর শক্তি বৃদ্ধি মানে বায়ুর স্থূলতা নাশ। বায়ুর স্থূলতা নাশ হবে বায়ু যত কম প্রবাহিত হবে তত। শ্বাসপ্রশ্বাস যত কম বইবে ও কম বিলম্বিত হবে অর্থাৎ নাসারন্ধ্র থেকে নিচের দিকে কম যাবে ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের পটেন্সির মত যতই তার পরিমাণ কম, ততই তার সূক্ষ্মতা ও শক্তি বৃদ্ধি। বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নাক টিপে প্রাণায়াম করার বিধান আছে—রেচক, পূরক ইত্যাদি। এ-সব হল কৃত্রিম পদ্ধতি। স্বাভাবিক পদ্ধতি হল মনকে কোন বিষয়ে নিবদ্ধ করা। মন কোন বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই বায়ুর ক্রিয়া কমে যাবে। মনকে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট করলে যে বায়ুর ক্রিয়া কমে যায়, পরিমাণে শ্বাস ও প্রশ্বাস কম ও বিলম্বিত হয়, যে-কোন মানুষ সহজেই তার প্রমাণ পেতে পারেন। রুদ্ধশ্বাস কোন কাহিনী পড়ার আগে নাসারন্ধ্রে একবার হাত দিয়ে দেখুন। এবং তারপর বই পড়ার সময় নাসারন্ধ্রে হাত রেখে দেখুন। তাহলেই শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার পার্থক্য বুঝতে পারবেন। মন যত একাগ্র হবে, বায়ু অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও ততই কমবে। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া

তই সূক্ষ্ম হবে। আর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া যত কমবে তার শক্তিও তই বাড়বে।

মূলাধারস্থিত শক্তি থেকে দশভাগের বেশি এনার্জি বিচ্ছুরিত উত্তাপে তা ব্যারোমিটারের পারার মত গলে যাবে। তখন স বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজবে, মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথ দিয়ে উপরে উঠতে চাইবে। মূলাধারে এক ধরনের গর্ত বা cavity-তে সুপ্ত থাকে। এই গর্তকে বলা হয় অনার্য ভাষাতে ণ্ড।* কুণ্ডস্থিত শক্তির এই জন্য নাম হয়েছে কুণ্ডলিনী। মরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্রপথ নানা স্থানেই আবর্জনা জমে বন্ধ য়ে থাকে। ছটি ক্ষেত্রে এই জঞ্জাল অত্যন্ত বেশী। এই ছটি ক্ষত্রই ষট্চক্র নামে পরিচিত। শক্তি উপরে ওঠার সময় প্রবল বগে এই আবর্জনাগুলিকে সরিয়ে দিতে চায়। ফলে তার প্রচণ্ড াক্কা খেয়ে দেহ নড়ে ওঠে। তন্ত্রশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে কম্পন। ায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনে মনঃসংযোগের এই জন্য তিনটি র্যায় আছে, যাকে তন্ত্রশাস্ত্রে বলে ঘর্ম, কম্পন ও ভূমিত্যাগ। নঃসংযোগ করতে গেলে মন কিছুতেই বসতে চায় না, উচ্পিচ্ রে। তখন অস্বস্তিজনিত ঘর্ম নির্গত হয়। এ হল আসনে াসার অর্থাৎ মনঃসংযোগ প্রয়াসের প্রথম পর্যায়। মনঃসংযোগ হলে ায়ু যখন নিয়ন্ত্রিত হয় তখন ঊর্ধ্বগামী হবার পথে এই জঞ্জাল- ুলি ঠেলে সরাতে গেলে মানুষের দেহযন্ত্র কেঁপে ওঠে। একে লে কম্পন। ধ্যানের এটা দ্বিতীয় পর্যায়। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথের জঞ্জাল সরে গেলে অব্যাহত গতিতে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডলে প্রবেশ করলে দেহকে শূন্যে তুলে ফেলে। একে বলে ভূমিত্যাগ। ভূমি- ত্যাগই হল আসনের শ্রেষ্ঠ পর্যায়। এই সময় মানুষের জিহ্বারও ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কারণ জিহ্বার শেকড় রয়েছে মূলাধারে। শক্তির চাপে এই জিহ্বা তখন বিলম্বিত হয়। কখনও বিলম্বিত

* O. D. B L. দ্রষ্টব্য।

হয়ে বাইরে আসে, কখনও ঘুরে নাসারন্ধ্র বন্ধ করে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে রুদ্ধ করে দেয়। তখন বায়ু গতিহীন হয়ে প্রবলতর হয়। মূলাধার থেকে অকল্পনীয় শক্তি সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। জিহ্বার এই বিলম্বিত ভাবই খেচরীমুদ্রা। শূন্যে ঝুলন্ত দেহের ভারসাম্য রাখে তখন এই জিহ্বা। এ সব হল দেহতত্ত্বের ক্রিয়ার কথা। এর সঙ্গে যুক্ত আছে অসংখ্য শিরা উপশিরাও, যাকে তন্ত্রশাস্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তন্ত্রবিদদের মতে দেহের মধ্যে এধরনের ৭২ হাজার বা ততোধিক শিরা উপশিরা আছে। কিন্তু এসব জটিল তত্ত্বের খোঁজ না করেও—শুধুমাত্র মনঃসংযোগ ক্রিয়া করতে পারলেই যে-কোন ব্যক্তি যোগসিদ্ধি অর্জন করতে পারেন।

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত সব প্রক্রিয়া-তত্ত্বই যে নির্ভুল এবং বৈজ্ঞানিক তা নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকারক। যেমন, এমন অনেক গুরু আছেন, ধ্যানকালে শিষ্যের মনঃচাঞ্চল্য দেখলে তার নিন্দা করেন। কিন্তু এত বড় ভ্রান্তি আর নেই। প্রকৃতপক্ষে মনঃচাঞ্চল্য এবং মনের নানা-ধরনের চিন্তা আত্মতত্ত্ব জানার ক্ষেত্রে বড় সহায়ক। Parapsychology পরীক্ষা করে দেখেছে যে, স্বপ্ন মানুষকে সুস্থ রাখার পক্ষে বড় সহায়। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা এবং অপ্রাপ্তির বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। সেগুলো তার মনের ভেতর জমে থেকে অশান্তি সৃষ্টি করে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি যদি বেরুবার পথ না পায় তা হলে মানুষের জীবনে নানা বিপত্তি ঘটতে পারে। সাধারণত দেখা যায় তারা উন্মাদ হয়ে যায়। মানুষ প্রতিরাত্রে স্বপ্ন দেখে বলে এই উন্মাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রতিটি মানুষ প্রতিরাত্রে কমপক্ষে চার বা ততোধিক স্বপ্ন দেখে। মনের মধ্যে চেপে থাকা এই সব নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বপ্নের আকারে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়। এই স্বপ্ন Non-

R. E. M. ও R. E. M. জাতের। অর্থাৎ প্রথম রাত্রে মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তাতে তার চোখের পাতা কম আন্দোলিত হয় (Non Rapid Eye Movement)। শেষের দিকে যে স্বপ্ন দেখে তাতে চোখের পাতা বেশি কাঁপে, যাকে বলে R. E. M. (Rapid Eye Movement)। তার এই স্বপ্ন দেখা E. E. G. অর্থাৎ Electro Encephalograph যন্ত্রে ধরা পড়েছে। স্বপ্ন দেখে বলেই মানুষ নর্মাল থাকে। যাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে যায়—তারা ক্রমশই উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। একে বলে approaching sign of insanity.

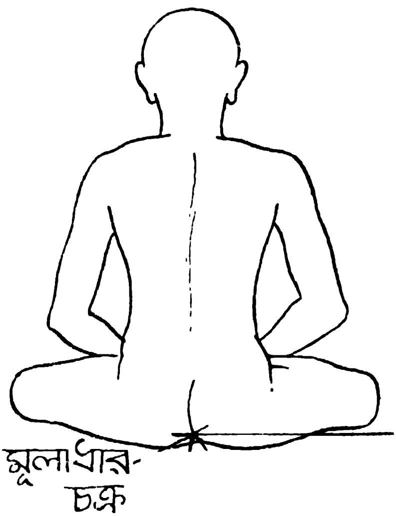
স্বপ্ন দেখলেও যে মানুষের ভেতরকার সকল অবরুদ্ধ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাই দূর হয়ে যায়, তা নয়। কিছু কিছু থেকে যায়। সেগুলোই সে যখন কোন কিছুতে একাগ্রচিত্ত হতে চায় তখন নানা চিন্তার আকারে বাইরে আসতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন চলার পরে দেখা যায় যে, তেমনভাবে বিশৃঙ্খল চিন্তাভাবনা আর তার ভেতর থেকে বেরুচ্ছে না। ক্রমশই তার দেহ হাল্কা হতে থাকে। ক্রমশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মধ্যে সংযম দেখা দেয়। তার নানা দূরদর্শন ও দূরশ্রুতি হতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও তার নজরে পড়ে। শাসন করে যারা মনকে সংযমে রাখতে চায়, তারা আসলে মনের কতকগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়াকে আবদ্ধ করে রাখে। মানুষের ভেতর নানা যে সূক্ষ্ম স্তর আছে অবরুদ্ধ কামনা-বাসনাগুলি তখন তার উপর আবরণ সৃষ্টি করে তার দৃষ্টিকে ঢেকে দেয়। এবং তাদের পক্ষেই সহজে অতীন্দ্রিয় জগতে পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মচর্য মানে যে নিস্পাত বীর্য ধারণ, তা নয়। ব্রহ্মচর্য অর্থ হল সংযম, সাম্য, balance. মানুষ তিন গুণের অধীন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণের কোন গুণ অতিরিক্ত প্রবল হলে সাম্য নষ্ট হয়। হিন্দুদের জীবনে আছে চারটি আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এর মধ্যে

সংযম থাকলেই যথার্থ ব্রহ্মচর্য হয়। হিন্দুমতে আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্থাৎ সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে চলা, টাকা পয়সা উপার্জন করা, ভোগ করা, আবার সত্যজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভ করা। এই চারটি আদর্শের মধ্যে যিনি সাম্য রাখতে পারেন তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য যদি নিস্পাত বীর্য-ধারণ হত তাহলে বশিষ্ঠ শতপুত্রের জনক হয়েও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হতেন না, বা যাজ্ঞবল্ক্য দুই বিবাহ করেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হতে পারতেন না।

সে-যাক, তত্ত্বকথা যাক, দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমরা যে কতকগুলি মরমিয়া গানের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলাম সে-কথাতেই আসা যাক। দেহতত্ত্বে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে শক্তির মূলাধার পর্যন্ত অবরোহণের কথা বলেছি, এবার আরেক পর্যায়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলা যাক। প্রাণায়ামের ফলে মূলাধারস্থ শক্তি যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন ক্রম ঊর্ধ্বপর্যায়ে শক্তি যে পর্যায়ে থাকে, আরোহ পর্যায়ে সেই সব ধাপের সূক্ষ্ম জগৎ সে অবলোকন করে। তবে এই অবলোকন যে সে চর্মচক্ষুতে করে তা নয়, করে তৃতীয় নয়নে। এই তৃতীয় নয়ন হল তার মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী। মূলাধারস্থ শক্তি এক এক ধাপ ঊর্ধ্বদিকে উঠলে মেরুদণ্ডরূপ তার (wire) বেয়ে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি করে। যদি অনুরূপ তরঙ্গের কোন জিনিসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে যায় তাহলে সেই পর্যায়ের ছবিগুলো তার রিসেপটিভ ব্রেনতরঙ্গে ধরা প'ড়ে টি. ভির. পর্দার মত ছবির projection তৈরি করে। ফলে বাংলার কোন ঘরে বসে যে তরঙ্গে তার মস্তিষ্কস্নায়ুগুলি রয়েছে অনুরূপ তরঙ্গের দূর আমেরিকার কোন শহর বা মানুষের চিত্র তার চোখে পড়তে পারে, বা ভিন্ন গ্রহ কিংবা গ্রহান্তরও তার দর্শনের মধ্যে আসতে পারে। অন্তত রাশিয়ানরা এই দূরশ্রুতি বা দর্শনকে সমান্তরাল তরঙ্গ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন

দেখা যাক শক্তির আরোহ পর্যায়ে ব্রেনতরঙ্গে কি কি দৃশ্য একজন সাধকের বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু গবেষকের তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে।

শক্তির আরোহ পর্যায়ে যখন সে মূলাধার চক্রে নড়ে ওঠে—তখন গবেষক অদ্ভুত এক রঙ দেখতে পান। সে রঙ সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা লালবর্ণের আকাশের মত অর্থাৎ ফ্যাকাসে লালরঙের কিছুটা ঘন-তরল অবস্থা। কেউ কেউ এই সময় একটি কালো হাতের আশীর্বাদ ভঙ্গীর লাল করতল দেখতে পান। তান্ত্রিকরা একেই বলেন ৺মায়ের হাত। যাঁরা এ হাত দেখতে পান তাঁদের ঊর্ধ্বগতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শন অনিবার্য। এ ছাড়া অকস্মাৎ বিদ্যুৎঝলকের মত তীব্র আলোকচ্ছটাও দেখতে পান কেউ কেউ। এ হল ঐশ্বরিক দীপ্তির ক্ষণিক প্রকাশ। তন্ত্রে এ ধরনের আলোকে বলা হয়েছে—'কোটি সূর্য বিভাষিতম্।' অর্থাৎ অকস্মাৎ যেন কোটি সূর্য জ্বলে ওঠে। সে এত তীব্র আলো যে, গবেষকের মনে হয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হয়তো বা অন্ধ হয়ে যাবে।



শক্তি যখন আর একটি ঊর্ধ্ব পর্যায়ে ওঠে তখন অর্থাৎ শক্তি স্বাধিষ্ঠান মণ্ডলে এলে তখন সেই ফ্যাকাসে লাভাতুল্য লাল রঙের মধ্যে বৃত্তাকার একটি সবুজ বৃত্ত দেখা যায়। সেই সবুজ বৃত্ত ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে জলো জলো ছায়া ছায়া এক জগতে প্রবেশ করে। দিনের বেলা পুকুরে ডুব দিয়ে চোখ মেলে তাকালে যেমন সবুজ

সবুজ ভাব দেখা যায় সেই রকম। পরে তা ধীরে ধীরে ছায়া ছায়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, সন্ধ্যাবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে চোখ মেলে তাকালে যেমন দেখা যায় সেই রকম হয়।



মূলাধারস্থ শক্তি যখন আর এক ধাপ উপরে ওঠে অর্থাৎ মণিপুর চক্রে আসে, তখন সে তেজোময় ধূম্রপুঞ্জ দেখতে পায়। সেই ধূম্রপুঞ্জ দেখতে অনেকটা নিদাঘদগ্ধ মধ্যাহ্ন গগনের মত। এর পর শক্তি যখন আরও উর্ধ্বে উঠতে আরম্ভ করে তখন সাদা মেঘের আকাশে যেন কোদালে মেঘের মউজ উঠে, অর্থাৎ সাদা মেঘ থোকায় থোকায়



কাটতে আরম্ভ করে, এবং তার ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশের মত আকাশ উঁকি দেয়। ঠিক যেন ছানাকাটা দুধের ফাঁকে নীল জল ফুটে ওঠার মত। যখনই অনাহত চক্রের দিকে শক্তির অগ্রগতি পথে সাদা জ্যোতির্ময় মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উঁকি দেয় তখনই গবেষক নিজের সারা দেহমনে অদ্ভুত এক আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন। কখনও কখনও যেন বহুদূর আকাশ থেকে সেই নীল অংশ বেয়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গম্ভীর এক ধ্বনি ভেসে আসে—অ-উ-ম, অ-উ-ম, অ-উ-ম। পাহাড়ের গুহা থেকে শব্দ করলে যেমন গম্‌গম্‌ করে প্রতিধ্বনি হয়—অনেকটা যেন সেইরকম রহস্যময় ধ্বনি।

এরপর শক্তি যখন অনাহত চক্রে গিয়ে স্থির হয় তখন শুধু নীল, নীল আর নীল। পরতে পরতে নীল সরে গিয়ে আরও



সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় নীল দেখা দিতে থাকে। সেই নীলের মধ্যে নানা ধরনের ছবি ফুটে উঠতে থাকে। যেমন, দূর দেশ, পর্বতশৃঙ্গ, সাগর, মরুভূমি, গ্রহান্তর, গ্রহান্তরের জীব, দেবদেবীর জীবন্ত ছবি, কখনও কখনও ভিন্ন গ্রহে রক্তমাংসের উন্নত জীব, যাদের মধ্যে কারো কারো আকৃতি আমাদের পূজ্য দেব-দেবীদেরই মত। বোধহয়

যোগীরা ধ্যানে এইসব দূরবর্তী গ্রহের জীব দেখেই দেবদেবীর কল্পনা করেছিলেন, যে জন্য বলা হয়েছে, 'যোগীনাম ধ্যান নির্মিতম্।' এই ধ্যানলব্ধ মূর্তির সঙ্গে তত্ত্ব যুক্ত করে তাকে ভিন্নতর রূপ দেওয়া হয়েছে, যেমন কালী। শক্তির দুর্বোধ্য শিহরণরূপে তাঁর বর্ণ করা হয়েছে কালো, অর্থাৎ যে আদি, যে শক্তির স্বরূপ ধারণার মধ্যে আনা যায় না। কৃষ্ণ বা কালো বর্ণ হল দুর্বোধ্যতার প্রতীক। নিষ্ক্রিয় শ্বেতশিবের বুকের উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে এইটুকু বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, শূন্যের বুকে নিষ্কম্প আবেগ বা চিৎ বা চৈতন্য (শ্বেতবর্ণ) থেকে তাঁর জন্ম। তাঁর নাম 'কালী' দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, energy রূপে তিনি নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কালের জন্ম হয়েছে। কালের (Time) জন্মদাত্রী হিসেবেই তিনি কালী। তাঁকে চার হাত দান করা হয়েছে এই কারণে যে, তার দ্বারা মহৎ একটি তত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, অর্থাৎ মহাশক্তি, যিনি জগৎরূপে ফুটে আছেন, তিনিই তা পালন করছেন, তিনিই তা ধ্বংস করছেন।[১] তাঁর গলায় পঞ্চাশটি ও হাতে একটি মুণ্ড দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, একান্নটি তরঙ্গে শক্তিরূপে তিনি স্থূল জগতের আকৃতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিলম্বিত জিহ্বা খেচরী মুদ্রার প্রতীক, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি সৃষ্টি করে তাতে সাম্য রক্ষা করছেন।*

মূলত শক্তির ঊর্ধ্বগতিতে মস্তিষ্কতন্ত্রীর তরঙ্গমাত্রার সঙ্গে সমপর্যায়ে তরঙ্গায়িত যত গ্রহ, গ্রহান্তর, জীব, সবই দেখা যায়। গঠন এবং আকৃতিতে তারা পার্থিব জগতের জীব থেকে ভিন্ন নয়। এমন কি উন্নত জীব, যাঁদের দেখে যোগীরা ধ্যানে দেবদেবী কল্পনা করেছেন,

(১) দক্ষিণ দুই করে বর ও অভয়, খড়্গধৃত বাম করে ধ্বংস ও মুণ্ডধৃত বাম করে সৃষ্টি।

* সাধকের দেহ ভূমিত্যাগ করলে খেচরী মুদ্রার সাহায্যে তিনি দেহের সাম্য (balance) রক্ষা করেন।

তাঁরাও মানুষেরই মত দ্বিহস্ত দ্বিপদ যুক্ত। পৃথিবীতে তাঁদের রূপান্তর মানুষের ভাবাদর্শ যোগ হবার জন্য, না হলে জীবজগতের চূড়ান্ত আকৃতিগত পরিণতি দ্বিহস্ত দ্বিপদের মধ্যেই রয়েছে, কারণ—মনুষ্যাকৃতি এই দেহের মধ্যেই জীবজগৎ তার চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা—যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানেই পরিণতি। এই বৃত্ত বা cycle শেষ হলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। সৃষ্টির যে পর্যায়ে জীব বা প্রাণিজগৎ আত্মপ্রকাশ করেছে, তা স্থূল জড় পর্যায়। সৃষ্টি প্রথম দৃশ্যমান হয় স্থূল জগতে। কিন্তু সৃষ্টি একটি অন্ধ আবেগে আপন পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে, অর্থাৎ যেখান থেকে সে এসেছে সেখানেই ফিরে যাবার পথে সে এগিয়ে চলেছে। দার্শনিক সোফেনহাওয়ার এই অন্ধ আবেগ বা গতিকেই বলেছেন—'Will', বের্গসঁ বলেছেন—Elan Vital. স্থূল থেকে ব্যাখ্যাতীত রহস্যে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। প্রাণ থেকে মনের, মন থেকে বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি ও অহংকারের। এই বুদ্ধি দ্বারা মানুষ বুঝতে শিখেছে যে, শূন্যতা থেকে সৃষ্টি, শূন্যতাতেই আবার ফিরে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক জীবনে বহু সাধুসন্ত এই শূন্যতাতে ফিরেও গেছেন। ফলে মনুষ্যদেহের বাইরে উৎকৃষ্টতর অন্য কোন দেহের প্রয়োজন নেই বলেই ভিন্ন গ্রহেও যে-সব উন্নত জীব দেখা যায় তারা ক্ষুদ্রাকার বা বৃহদাকার হলেও দ্বিহস্ত দ্বিপদ বিশিষ্টই, তার বাইরে নয়।

অনাহত চক্রের স্বচ্ছ নীল আকাশেই যে প্রথম অলৌকিক দর্শন হয়, তা নয়। তার আগেও মাঝে মাঝে নানা অলৌকিক জ্ঞান হয়। তার মধ্যে কিছু হয় তো আপন মনের সংস্কারের প্রতিফলন, কিছু হয়তো বা সত্য, যেমন ঘূর্ণায়মান শিবলিঙ্গ বা বলয়যুক্ত শনিগ্রহ। শিবলিঙ্গ আর কিছুই নয় বিন্দু—যাতে পুরুষ (শূন্যতা) ও প্রকৃতি একাত্ম হয়ে আছে। আনন্দ অর্থাৎ বিন্দু পর্যায়ে শূন্যের

চতুর্দিকে এই বিন্দু ঘূর্ণায়মান হয়, অর্থাৎ বিন্দু শূন্য বা পুরুষের চতুর্দিকে গৌরীপট্টের মত বিরাজ করে। যোগীরা হয়তো এ-দেখেই শিবলিঙ্গের কল্পনা করেছিলেন।

অনাহত চক্র ছাড়িয়ে শক্তি উপরের দিকে উঠতে থাকে। তখন নীলরঙ ক্রমশ উজ্জ্বলতর ও সূক্ষ্মতর হতে আরম্ভ করে। অবশেষে



বিশুদ্ধচক্রে এসে পৌঁছুলে তা নীল জ্যোতির আকার ধারণ করে। এই 'জ্যোতির্ময় নীল' দিব্যজগতের খুব কাছাকাছি। এখানে নানা দিব্যমূর্তি দর্শন হয়। তবে তাঁরা কেউ রক্তমাংসের নন। হয় গবেষকের মনের প্রক্ষেপণ অথবা দৈবীসত্তার সূক্ষ্মরূপ। শক্তিকে এখানে তুলতে পারলে নানা দৈবীভাবে দেহ অনুরণিত হতে থাকে। বিশুদ্ধচক্র থেকে শক্তি যখন আরও ঊর্ধ্ব দিকে এগিয়ে চলে তখন 'জ্যোতির্ময় নীল' আরও সূক্ষ্মতর হতে আরম্ভ করে। এখানে নানা দিব্যদর্শন ও পার্থিব জগতের বিগত মহাত্মাদের অর্থাৎ উচ্চকোটী সাধকদের বহু সূক্ষ্মদেহ দর্শন হয়। এরপর শক্তি যখন ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করে তখন নানা-রঙের বিস্ফোরণ হতে থাকে। মাঝে মাঝে এখানেও নানা দিব্যদর্শনও হতে থাকে।

আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ অনুমতিচক্র পার হলে সপ্ততলে অর্থাৎ স্থায়ী দিব্যজগতে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। এখানে পূর্বে-বর্ণিত সকল রঙের তন্মাত্র অর্থাৎ essence পুনরার সূক্ষ্ম-



রূপে দেখা যায়। তারই মাঝে মাঝে দৈবী-সত্তার তন্মাত্ররূপ চোখে পড়তে থাকে। আজ্ঞাচক্র হল দিব্যজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র স্বরূপ।

মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথ তখন পরিষ্কার হয়ে যায়। মূলাধারের কুণ্ডস্থিত শক্তির ঊর্ধ্বযাত্রাপথে তখন আর কোন বাধাই থাকে না। বিনা বাধায় শক্তি দ্রুত ঊর্ধ্বে উঠে সপ্ততলে চলে যায়। সপ্ততলে নানা বর্ণের ও নানা দৃশ্যের তন্মাত্র দর্শনের পর শক্তি প্রবেশ করে বিন্দুতে। তখন বিন্দু অদৃশ্য হয়। বিন্দুর পরিবর্তে শুধুমাত্র জ্যোতি দর্শন হতে থাকে। সপ্ততলে নানাবর্ণ মাঝে মাঝেই অনন্ত আকাশে কোটিচন্দ্রপ্লাবিত জ্যোৎস্নার প্লাবনে মনপ্রাণকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বিন্দুতে ঢুকলে সূক্ষ্ম অহংবোধ ও দিব্যবোধ একাত্ম হয়ে অদ্ভুত এক পরিপূর্ণ আনন্দ দান করতে থাকে। যেন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি অথচ তাকে বোধ করে

আনন্দও পাচ্ছি, এইভাব। বিন্দুর এই জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশ করলে ব্যক্তিমানুষের নিজের মধ্যেই দৈবী ক্ষমতা দেখা দেয়।



বিন্দুর জগতে প্রবেশ করলে জ্যোতি ছাড়া সে তখন আর কিছুই দেখে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় চোখ বুজলে সেই দিব্যজ্যোতি নানা রূপ অংকন করে প্রতীকী ভাষায় কথা বলে। ঠিক যেন আকাশের মেঘ। আকাশের মেঘ যেমন এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে—সেই জ্যোতিও নানারূপ ধারণ করে ইঙ্গিতে কথা বলতে থাকে। জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যেন তার চৈতন্যসত্তায় ধৃত হয়ে আছে। ইচ্ছামাত্র প্রতীকীরূপে সে-সম্পর্কে নানা ইঙ্গিত দেয়।

শক্তি যখন আরও এগিয়ে যায় তখন দেহভার আর থাকেই না। দেহ শূন্যে ভাসমান হয়। জিহ্বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে—কুম্ভক হয়। পার্থিব জগৎ লুপ্ত হয়ে শুধুমাত্র স্বচ্ছ দর্পণতুল্য এক দেশ বিরাজ করে। সেই দর্পণে জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্ব হিসেবে বিরাজ করে। ব্যক্তি সর্বদ্রষ্টা হন। ইচ্ছাশক্তি করায়ত্ত

হয়। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ক্ষমতা জন্মে। শক্তি এই চিৎ পর্যায়ে পৌঁছুবার অনেক আগেই মানুষের মধ্যে আত্মিক শক্তি জন্মায়, যাকে ইংরেজীতে বলে Psychic Power. এই আত্মিকবলে বহু লোক রোগ নিরাময় ইত্যাদি করে থাকে। চিৎ পর্যায়ে স্থিত হলে মৃতকেও জীবন দান করা যায়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করানো যায়, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি করায়ত্ত হয়। কারণ, এই চিৎ পর্যায় থেকেই শক্তি আত্মপ্রকাশ করে—এই জন্য শক্তির নাম চিন্ময়ীও বটে। এর উপর শক্তি যখন আরও এগোয় তখন ক্রমশ বোধশক্তি লোপ পেতে থাকে। এক সময় সব কিছুই হারিয়ে যায়। কোন কিছুই বোধের মধ্যে থাকে না। এই হল শূন্যস্থিত শক্তির জগৎরূপ। গতিশীলরূপ) ত্যাগ করে পুনরায় শূন্যে সুপ্ত হওয়া—ভারতীয় শাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে সমাধি। শক্তিকে বিপরীত মুখে ফিরিয়ে নিয়ে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় বলে এই আচারকে বাম (বিপরীত) আচার বা বামাচার নাম দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেহতত্ত্বের ভিত্তিতে মরমিয়া গানের ব্যাখ্যা

এবার এই দেহতত্ত্বের ভিত্তিতে মরমিয়া গানগুলির ব্যাখ্যা করা যাক, যে গানের ধাঁধা তুলে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান গ্রন্থে লেখক আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন—যেমন লালন ফকিরের সেই গানটি—'ঘরের কাছে আর্শিনগর দেখতে পেলাম না।'

উপরোক্ত গানটির যদি দেহতত্ত্ব না জেনে বাক্যার্থ করা যায় তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'ঘরের কাছে অর্থাৎ—যে আচ্ছাদনের নিচে আমরা বাস করি তার কাছে আর্শিনগর অর্থাৎ আয়না বা দর্পণনগর আছে। সেই নগর আমরা দেখতে পাইনি'। এই বাক্যার্থের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে এবং এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকলে অধ্যাত্মজগতের এক বিরাট রহস্যময় ক্ষেত্র ধরা পড়ে যায়। এর ভাবার্থ এই রকম ঃ ঘর হল মানুষের দেহ—যে দেহের মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইই বাস করে। বাইরে থেকে দেখলে এ দেহ একটি স্থূল পদার্থের রূপরেখা মাত্র। কিন্তু চোখ বুজে নিজের মধ্যে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় সেখানে নানাস্তরের বিস্তৃত পরিধির একটি স্বচ্ছ জগৎ। সেই স্বচ্ছতা স্বাধিষ্ঠান চক্র থেকেই ফুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু নিচের দিকে সে বেশি রকম অস্বচ্ছ এবং উপরের দিকে ক্রমশ বেশি স্বচ্ছ। চৈতন্যমণ্ডলে সে স্বচ্ছতম। সেই স্বচ্ছতা একটি দর্পণের মত—সেখানে বহির্জগতের নানা দৃশ্য প্রতিবিম্বের মত ফুটে আছে। মূলাধারস্থ শক্তি—দেহপর্যায়ের যে স্তরে উঠে যে তরঙ্গমণ্ডলে বিরাজ করে—সমপর্যায়ের তরঙ্গমণ্ডলের সব ছবিই সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ equal wavelength casts the picture of equal wavelength. অর্থাৎ T. V.-তে যে রকমটি হয়ে থাকে সেই রকম। স্বাধিষ্ঠান মণ্ডলের স্বচ্ছতায়

যে ছবি ফুটে উঠে তা অস্পষ্ট, কারণ, এখানকার স্বচ্ছতা ধুলো জমা আয়নার মত। চৈতন্যশক্তি আরও উপরে উঠলে অর্থাৎ আত্মমগ্নতা আরও গভীরে প্রবেশ করলে স্বচ্ছতার নতুন এক পর্যায় লক্ষ্য করা করা যায়। মণিপুর চক্রে এই স্বচ্ছতা হাল্কা মেঘে ঢাকা নিদাঘের মধ্যাহ্নগগনের মত। আত্মমগ্নতা আরও গভীর হলে নিজের দেহের মধ্যে নীলাভ স্বচ্ছ এক আকাশ চোখে পড়ে। অনন্ত পরিধি এই নীলিম আকাশে নানা দৃশ্য চোখে পড়ে। চোখ বুজেও এসব কিছু দেখা যায়—অর্থাৎ মস্তিষ্কস্নায়ুতে তরঙ্গের সামঞ্জস্য হেতু অনুরূপ সব ছবি ফুটে ওঠে। এই মস্তিষ্ক স্নায়ুই হল তৃতীয় নয়ন। এই অসীম নীলিম আকাশই হল নজরুলের গানের উৎস—যখন তিনি লিখেছেন, 'ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর, এদেহে অসীম নীলাম্বর।' যে পর্যায়ে নীলাভ অনন্ত-বিস্তার আকাশে এই সব রহস্যময় দর্শন হয় তাকেই দেহতত্ত্বে অনাহতচক্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মমগ্নতা আরও তীব্র হলে জ্যোতির্ময় এক নীলাভ ব্যাপ্তি চোখে পড়ে। এখানেও নানা অলৌকিক দর্শন হয়। দেহতত্ত্বে এই পর্যায়কে বিশুদ্ধ চক্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মমগ্নতা আরও তীব্রতর হলে এমন এক পর্যায়ে যাওয়া যায় সেখানে অকস্মাৎ বিস্ফোরণে নানা রঙের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে থাকে। দেহতত্ত্বে এই পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্রই হল দৈবী জগতে অর্থাৎ সপ্ততলে প্রবেশের ছাড়পত্র। নিম্ন ষট্‌চক্রের সকল রঙ ও স্বচ্ছতার এখানে তন্মাত্র অভিনয় হয়ে থাকে। স্বচ্ছ আয়নায় ফুটে থাকা প্রতিবিম্বের মত নানা রহস্যময় দর্শন হয় এখানে। বিন্দুমণ্ডলে কোন দর্শন হয় না কিন্তু আরও ঊর্ধ্বে উঠলে শাশ্বত স্বচ্ছ স্তরে অর্থাৎ চৈতন্যমণ্ডলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই ফুটে থাকতে দেখা যায়। মানুষ নিজেই ঈশ্বরতুল্য হয়। সে তখন বলতে চায় '<u>সোঽহং</u>'—অর্থাৎ <u>আমিই</u> সেই। অর্থাৎ আমার

মধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। এই দর্পণ-সদৃশ জগৎ যা মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে, সাধনার অভাবে মানুষ তাকে দেখতে পায় না। রামপ্রসাদের সেই গানের মত 'মানব জমিন রইল পতিত ফসল দিলে ফলত সোনা।' কর্ষণের অর্থাৎ কৃষ্টি বা চর্চার অভাবে মানুষ নিজের অভ্যন্তরের সত্যকে জানতে পারে না। যা আছে নিজের মধ্যে লুকিয়ে, তাকে পাবার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়ায়। ইদানীং কালে বৈজ্ঞানিকেরা রকেটে মহাকাশ অভিযান করেন। এত কাছে সত্য লুকিয়ে আছে সে খবরটাই তাঁরা রাখেন না। এই জন্যই লালন ফকির লিখেছেন, 'ঘরের কাছে আর্শিনগর দেখতে পেলাম না।'

অন্তর্জগতের এই যে রহস্যময় ক্ষেত্র এটা শুধু রহস্যময় অনুভূতিই নয়, বাস্তব বিশ্লেষণী বুদ্ধিতেও এর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এ নিয়ে আজকাল রীতিমত রিসার্চ হচ্ছে প্যারা সাইকোলজি ডিপার্টমেণ্টে। প্যারাসাইকোলজি বা অধি মনো-বিজ্ঞানে একটি জিনিস ধরা পড়েছে যে, বহিরিন্দ্রিয় বন্ধ করলে মানসিক কার্যকলাপের ক্ষমতা বেড়ে যায়। মনই তখন ইন্দ্রিয়ের কাজগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। শুধু পারে না নয়, এমন সব অদ্ভুত কাজ সে করতে পারে, যাকে বলা যায় অতীন্দ্রিয় দর্শন। প্যারাসাইকোলজির ভাষায় E. S. P. অর্থাৎ extra sensory perception. প্যারাসাইকোলজিতে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বহিরিন্দ্রিয় বন্ধ হলে অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। চর্মচক্ষে না দেখা গেলেও অনেক কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্ভুত ধরনের এক টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা জন্মে যায় মনের। কিন্তু কি ভাবে এই ক্ষমতা জন্মে, কিভাবে এই অতীন্দ্রির দর্শন হয়, সে বিষয়ে এরা তেমন ওয়াকিবহাল হতে পারেন না। বহিরিন্দ্রিয় বন্ধ করে চোখ বুজে মনের মধ্যে যে ছবি তারা দেখেন, সে ছবি কোথায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়, এ নিয়ে তাঁরা তেমন বিচার

বিশ্লেষণ করতে পারেননি। বিষয়টি ভারতীয় যোগশাস্ত্র পুঙখানু-পুঙখরূপে বিশ্লেষণ করে এর যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। এই অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়তো দেহের ভেতর যে স্বচ্ছ অবস্থা আছে সেই স্বচ্ছ দর্পণ থেকে হয়, যাকে লালন ফকির আর্শিনগর বলে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমী অধিমনোবিজ্ঞানে এই অতীন্দ্রিয় দর্শন সম্পর্কে সমীক্ষা করা হয় টেলিপ্যাথির আকারে। যেমন একটি Sound Proof ঘরে কাউকে বসিয়ে দেওয়া হল। তার চোখ এবং কান বন্ধ করে দেওয়া হল। পাশের ঘরে একজন কতকগুলি ছবির উপর মনোনিবেশ করলেন। তিনি যে বিশেষ ছবিটির উপর মনোনিবেশ করলেন রুদ্ধকক্ষে চোখ কান বন্ধ অবস্থায়—পরীক্ষার্থী ব্যক্তিটি দেখা গেল ঠিক সেই ছবিটির বর্ণনাই দিচ্ছেন। পরে যখন তাকে অনেকগুলি ছবি দেখানো হল তার মধ্য থেকে ঠিক সেই ছবিটিই তিনি নির্ভুলভাবে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন। এ ধরনের দর্শনকে প্যারাসাইকোলজি টেলিপ্যাথি বলে। অর্থাৎ একজনের চিন্তাতরঙ্গ আর একজনের মস্তিষ্কে আঘাত করে অনুরূপ ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। পশ্চিম জগৎ একে মনের একটি বিশেষ ক্ষমতা বলে ধরে নিয়েছে। মনের এই বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। তবে বিষয়ের দর্শন যে সব সময় যথাযথ হয়, তা নয়। অনেক প্রতীকের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থী নিরীক্ষামূলক বিষয়টিকে দেখতে পায়, যেমন আমেরিকাতে একটি পরীক্ষাগারে হয়েছিল। পরীক্ষক একটি বিশেষ ছবির উপর মনোনিবেশ করেন। ছবিটি ছিল কাম্পুচিয়ার উপর আমেরিকার গোপন বোমাবর্ষণ। পরীক্ষক চিত্রটির উপর নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করলেন, ভিন্ন ঘরে পরীক্ষার্থী তার অন্তর্জগতে অদ্ভুত এক ছবি দেখলেন। ছবিটি এই রকম ঃ 'প্রেসিডেণ্ট নিকসন নাক ঝাড়ছেন।' এই নাক ঝাড়াটা হল দোষস্খালনের চেষ্টা। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল প্রেসিডেণ্ট নিক্সনেরই সময়। বস্তুত অতীন্দ্রিয় দর্শন কখনও কখনও হুবহু পরীক্ষা

গ্রহণের বিষয়টির অনুরূপ হয়, কখনও বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে সে কথা বলে। ঐশ্বরিক জগতের ভাষা এই প্রতীকময়তা দিয়েই তৈরি, সে কথা পরে বলব।

অতীন্দ্রিয় দর্শনকে আমেরিকার মত দেশ কিছুটা অলৌকিক বলে মনে করলেও সোভিয়েট রাশিয়া লৌকিক বিজ্ঞানের প্রথাসিদ্ধ ঘটনা বলে মনে করে। তাদের মতে, টেলিপ্যাথি বা চিন্তাতরঙ্গের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করা থেকেই এমন ঘটে। কিন্তু তারা বিপদে পড়েছে পরীক্ষাথীর ভবিষ্যৎ-বাণী নিয়ে। ধরা যাক ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটা একজন বললেন। এক্ষেত্রে Wavelength তত্ত্ব অর্থাৎ বিষয় থেকে উদ্ভূত তরঙ্গ ধরে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা নয়। সামনে কোন বিষয় নেই, যে বিষয় সম্পর্কে এই ভবিষ্যৎ বাণী। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কোন বিষয় (Object) না থাকলে Wavelength তত্ত্ব কাজ করে না। আমেরিকানরা এর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করবেন না, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এই অলৌকিকতাকে স্বীকার করতে পারে না, কারণ, তাহলে মার্কসীয় তত্ত্বের বস্তুবাদ অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই জন্যই তাদের প্যারাসাইকোলজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে আছে—কিন্তু যোগসাধনারত যে কোন ভারতীয় সাধকই বলবেন যে, রুশ তত্ত্ব সঠিক। এক্ষেত্রেও Wavelength কাজ করে। কিন্তু কিভাবে সেই Wavelength কাজ করে এ বিষয়ে পশ্চিমী বস্তুবিজ্ঞানী বা অধিমনোবিজ্ঞানী কেউ ওয়াকিবহাল নন। এবিষয়ে **সূক্ষ্ম জগতে যোগদর্শন** অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখাব। এক্ষেত্রে এক্টোপ্লাজমের (Ectoplasm) সন্ধান পেয়েও Wavelength তত্ত্ব যে পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা কেন ধরতে পারছেন না, সেটা একটা অবাক হবার মত বিষয়ই বটে। এর কারণ হয়তো এই যে, আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। যাই হোক, প্যারাসাইকোলজির এ তত্ত্ব এখন থাক। একথা সত্য যে, প্যারাসাইকোলজি পশ্চিমী বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের অনেকটাই

ভাবিয়ে তুলেছে। বুদ্ধিতে এবং বস্তুবিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা চলে না, এমন সব ঘটনা দেখে তারা হতচকিত। কিন্তু হতচকিত হত না যদি আর্শিনগরের যথার্থ স্বরূপ তারা জানতে পারত। যাই হোক. সেই মরমিয়া গানের পর্যায়েই আবার ফিরে আসা যাক।

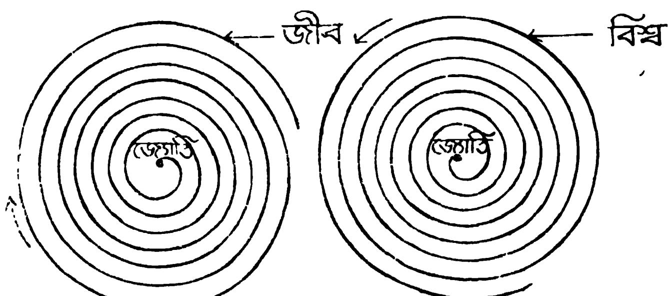
এবার আমরা রামপ্রসাদ সেনের গানটির যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যা করছি যা তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে বিশ্লেষণ দ্বারা ধরা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রামপ্রসাদ লিখেছেন, 'এবার কালী তোমায় খাব।' বাহ্য অর্থে এতো একটি রাক্ষুসে ক্ষুধার পর্যায়ে পড়ে। এ যেন আফ্রিকার নরখাদক কোন কবির লেখা গান। অন্তর্জগতে যার প্রবেশাধিকার নেই এমন পশ্চিমী বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে এ গানটি 'ননসেন্স ভার্সে'র চাইতেও অ্যাবসার্ড প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু দেহতত্ত্ব জ্ঞাত হবার পর এ গানের লাইনটির দিকে একটু যদি বিশ্লেষণী মানসিকতা নিয়ে তাকানো যায়—তাহলে গভীরতর এক দর্শন এর মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে। কালী হলেন আদি শক্তি, শাক্তশাস্ত্রে যাকে বলে আদ্যাশক্তি (Primal energy, kinetic in nature)। শূন্যে সুপ্তাকারে স্থিত এই শক্তি স্বভাবগুণে নড়েচড়ে উঠামাত্র সময় বা কালের (Time) উদ্ভব হয়েছে। কালের জন্মদাত্রী বলেই তিনি কালী! এই শক্তিই গোলাকার ব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎ হয়েছেন।* মানুষের দেহের মধ্যে এই জগতের ক্ষুদ্র সংস্করণ কাজ করছে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত (দেহতত্ত্ব অংশ দ্রষ্টব্য)। মূলাধারে এসে স্থির হয়ে যাওয়া এই শক্তিকে যদি সূক্ষ্ম বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ব্যারোমিটারের রন্ধ্রপথে উর্ধ্বমুখী পারার মত এই শক্তি উল্টোগতিতে উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে ফিরে চলে। ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্যতার মধ্যে তাকে লুপ্ত করে দিতে পারলেই—জগৎলীলা শেষ। জগৎ মানেই মায়া, জন্ম মৃত্যু এবং সুখদুঃখের বৃত্তাকার খেলা। শূন্যে এই শক্তি

* কিছুটা শক্তির ঘূর্ণনের ফলে elliptical।

লয়প্রাপ্ত হলেই জগৎলীলারও শেষ, অর্থাৎ মুক্তি। মূলত যে সব যোগী ব্রহ্মরন্ধ্রের এই শূন্যে তাঁদের চেতনাকে নিয়ে যেতে পারেন— তাঁরা পরম এক প্রশান্তি বোধ করেন। এরপর জীবদেহে বেঁচে থাকলেও সুখদুঃখ কোনটাই তাঁদের উদ্বেলিত করতে পারে না। তাঁরা গীতার সেই ভাব প্রাপ্ত হন: 'দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু-বিগতস্পৃহ'। ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্যস্থানকে বলা হয় পরমাত্মন বা 'আত্মন'। সেখানে শক্তির লুপ্ত হওয়া মানে আত্মস্থ হওয়া। এই আত্মস্থ করাকেই বলে খেয়ে ফেলা। যিনি শক্তিকে এইভাবে আত্মস্থ করতে পারেন তিনি পরম প্রশান্তি প্রাপ্ত হন, কারণ, উপনিষদে এই আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'শান্তো ইয়মাত্মা।' অর্থাৎ এই আত্মা অত্যন্ত শান্ত। নিবিড় নিদ্রায় যে প্রশান্তি অনুভব করা যায় এই প্রশান্তি সেই রকম। চঞ্চলা শক্তিকে এই ভাবে আত্মস্থ করা গেলেই তাকে খেয়ে ফেলা হয়। সাধকের মূল লক্ষ্য এই শক্তিকে আত্মস্থ করা। সুতরাং গভীরতর এক ভাববোধ থেকেই রামপ্রসাদ সেন এই গানটি রচনা করেছেন।

মীরার—'জ্যোতিসে জ্যোতি মিলাও'ও দেহতত্ত্বের গভীরতর পর্যায়ের গান। মূলাধারস্থ শক্তিকে যখন বিন্দুর জ্যোতির্মণ্ডলে নিয়ে যাওয়া যায় (দেহতত্ত্ব অংশ দ্রষ্টব্য) তখন মানুষের চেতনাতে সংস্কারের স্থূল বন্ধন এতটাই সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, জ্যোতিপূর্ণ সূক্ষ্মতম কাঁচের মত হয়ে যায় তা। বিন্দু পর্যায়ে পেঁছুলে সেই সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় কাঁচস্বরূপ জীবাত্মার আত্মসত্তায় বিশ্বের বিন্দু-সত্তার জ্যোতি এসে মিশে যায়। ব্যবধান থাকে অথচ তাকে একাত্ম বলে বোধ হয়। তখন দ্বৈতে থেকে অদ্বৈত এক মিলনের বর্ণনাতীত আনন্দ উপলব্ধ হয়। যারা প্রেমিকসাধক তাঁরা এই আনন্দ ত্যাগ করে নির্বিকল্প প্রশান্তির মধ্যে সকল বোধ হারিয়ে ফেলতে চান না, যে কারণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভাবমুখে থাকতে চাইতেন। সাধক বা সাধিকা তখন কেবল সেই ভাবমুখেই থাকতে চান। এই

জন্যই মীরা নিজের স্থূল সত্তার বহু আবরণ খুলে ফেলে আত্ম-জ্যোতির মধ্যে বিশ্বজ্যোতির অনুপ্রবেশ উপলব্ধি করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠেছিলেন—'জ্যোতি সে জোতি মিলাও।' আত্ম এবং বিশ্ব, গঠনের দিক থেকে একই ধরনের। দুইই সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে এসেছে। দুইয়েরই সূক্ষ্ম অংশ পরতে পরতে স্থূলতার আবরণে আবদ্ধ। কিন্তু দুজনের অবস্থান ঘূর্ণনের দিক থেকে ঠিক বিপরীত মুখে, যেমন বিজ্ঞানে ম্যাটার ও অ্যাণ্টিম্যাটার। ম্যাটারের চার্জ যদি Positive হয় অ্যাণ্টিম্যাটারের চার্জ হয় Negative. ম্যাটার যদি বাঁ দিকে ঘুরে অ্যাণ্টিম্যাটার ঘুরে ডান দিকে। জীবাত্মা ও বিশ্বের গতিও ঠিক সেই রকম। জীবাত্মা বাঁ দিকে স্থূল আবরণের এক প্যাঁচ খুললে বিশ্বও ডান দিকে স্থূল আবরণের এক প্যাঁচ খুলে ফেলে। জীবাত্মা তাঁর প্যাঁচ খুলে যখন আত্মস্থ-জ্যোতিতে প্রবেশ করে বিশ্বও তখন তাঁর প্যাঁচ খুলে নিজস্ব জ্যোতিতে প্রকাশ পেতে থাকে। তারপর উভয়েরই শেষ প্যাঁচটুকু খুলে গেলে অন্তরস্থ দুই শূন্য এক হয়ে মিলে যায়। দ্বৈত অদ্বৈত হয়ে একাকার হয়। অবস্থাটা ঠিক এই রকম :



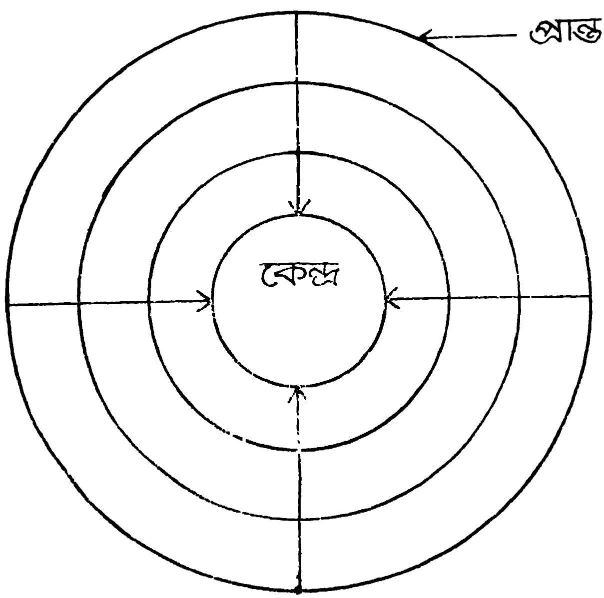
জীবের ষড়প্যাঁচ খুলে সে যখন অন্তরস্থ জ্যোতিতে প্রবেশ করে, বিশ্বও বিপরীত দিকে তার প্যাঁচগুলি খুলে অন্তরস্থ জ্যোতি প্রকাশ করে। সূক্ষ্মতম ব্যবধানের মধ্য দিয়ে এক জ্যোতি

অপর জ্যোতির সঙ্গে মিশে যায়, যেমন কাঁচের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটির ভাবও যাঁরা আত্মতত্ত্ব ও জগৎ তত্ত্ব জানেন না তাঁদের পক্ষে লক্ষ ভাষ্য পড়েও কোন দিন প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। সঙ্গে একটু বিজ্ঞানপরিচয় থাকাও প্রয়োজন। ভগবদ্গীতায় জগৎ-এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ভাবে—

'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥'

অর্থাৎ—'এই সংসাররূপ মায়াময় বৃক্ষের মূল (কারণ) ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মে। হিরণ্যগর্ভাদিশাখা নিম্ন দিকে, কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ ইহার কাণ্ড।' অর্থাৎ সংসাররূপ অর্থাৎ



জগৎরূপ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে, শাখা প্রশাখা কাণ্ড ইত্যাদি নিচের দিকে। যোগদর্শনজাত গীতার এই জগৎবর্ণনা যে কত সত্য

অধুনা Astro-physics-ও তা অনুমোদন করছে। কারণ, Astro-physics-এর Big-Bang তত্ত্ব বা Steady State তত্ত্ব এ কথাই বলে যে, কোন কেন্দ্রস্থিত বস্তুকণাসমূহে শক্তির বিস্ফোরণেই গোলাকার জগতের সৃষ্টি।* যেখান থেকে জগৎ বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেটাই তার কেন্দ্র। ছবিটি দাঁড়ায় এই রকম :

এই বৃত্তাকার জগতের যে দিক থেকেই কেন্দ্রের অভিমুখে যাওয়া যাক না কেন, কেন্দ্রকে ঊর্ধ্বমুখী মনে হবে। সুতরাং জগৎ (সম্প্রসারণশীল গোলক)-এর মূল ঊর্ধ্বে ও ডালপালা (অর্থাৎ সূক্ষ্মাংশ থেকে স্থূল অংশ) নিচের দিকে। বস্তুবিজ্ঞান, আত্ম জ্ঞান এবং অন্তর্জগতের স্বরূপবোধ হলে তবেই এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি ?'

গানটি বরং ভগবদ্গীতার উপরোক্ত শ্লোকটি থেকেও দুরূহ। কারণ, দেহের অভ্যন্তরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে—ঊর্ধ্ব পর্যায়ে নিয়ে যেতে না পারলে এ গানের অন্তর্নিহিত রহস্য কারো পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব নয়। দেহতত্ত্ব অংশে মূলাধারস্থ শক্তির ঊর্ধ্বগতিতে অন্তর্দৃষ্টিতে কিভাবে নানা রঙের খেলা দেখা যায় তা পূর্বাহ্নেই ব্যক্ত করেছি। প্রকৃতপক্ষে আন্তরসত্তা রীতিমত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চেতনাকে মণিপুরচক্র অবধি ওঠালেই। অনাহত চক্রের নীল আকাশে চেতনা উঠলে প্রায়শই মনে হয় আকাশ যেন সহস্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত। সেই স্নিগ্ধজ্যোতি আন্তর আকাশের চন্দ্রকিরণ দেখলে প্রাণে এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করা যায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় খোলা ছাদে দক্ষিণ সমুদ্রের ভেজা হাওয়া গায়ে লাগলে যেমন স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত ভাব বোধ হয়, এই দর্শনজাত ভাব ও অনুভূতিও তেমনি। সাধক আন্তর আকাশে এই জ্যোৎস্নার লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তন্ত্রে এই জন্য এই

* এই শক্তি ঘূর্ণায়মান হবার জন্য জগৎ কিছুটা Elliptical.

আকাশকে বলা হয়েছে 'কোটী চন্দ্র সুশীতলম্' অর্থাৎ কোটী চন্দ্র যেন এই আকাশকে সুশীতল করে রেখেছে। এই চন্দ্রকিরণ ধৌত আকাশ দেখেই দেহতত্ত্বের কবি মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন : 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি ?' আমরা ভেবে করব কি কথার অর্থ হল, বিচার বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে এর কারণ ধরা পড়বার নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।' এর ব্যাখ্যাও কোন্ বাংলার অধ্যাপক করবেন ? উপরে যে দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছি তাতে কোথায় জ্যোতিসমুদ্র তার কথা বলেছি। আসল জ্যোতি সমুদ্র হল বিন্দু। কিন্তু এই জ্যোতি দর্শন আরম্ভ হয় মণিপুর-চক্র থেকেই। মণিপুর চক্র থেকে সহস্রারের মূল জ্যোতি পর্যায় পর্যন্ত ওঠাকালে জ্যোতির মধ্যভাগে সাধকেরা 'বিন্দু'র অস্তিত্ব দেখতে পান। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সেই বিন্দু থেকে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুসদৃশ ফুল্‌কি বেরিয়ে আসছে। আসলে এই বিন্দুই হল আত্মজগতের জ্যোতিসমুদ্রে শতদল পদ্মের মত। জ্যোতিসমুদ্রে চৈতন্যসত্তাকে ছড়িয়ে দিয়ে যে সাধক এই বিন্দু-নির্গত পরমাণুকণাগুলি দেখতে পান—তিনি অপার আনন্দে মুগ্ধ হন। এই বিন্দুজ্যোতিকণাই শতদল (অনন্ত দল) পদ্মের মধুস্বরূপ। সেই অলৌকিক মধুর দৃশ্য দেখে বিহ্বল হওয়ার অর্থ হল—শতদল পদ্মের মধু পান করা।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানের কলি—যা প্রায়ই ভোরবেলা রেডিওর সঙ্গীতাঞ্জলিতে শোনা যায়—'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।' এও এক অদ্ভুত হেঁয়ালী ভরা গান। এ গান সম্পূর্ণই মরমিয়া। অদ্ভুত এক তন্ময় অবস্থা থেকে এ বোধ আসে অর্থাৎ Trance থেকে। দেহতত্ত্বে ষট্‌চক্রের কথা বলেছি। এই ষট্‌চক্র ভেদ করে সাধক যখন বিন্দুর

জ্যোতির্মণ্ডলও পার হন এবং চৈতন্যলোকের স্বচ্ছতা অতিক্রম করতে যান, তখন কেন্দ্রস্থিত শূন্যতা সমস্ত বোধ লুপ্ত করে দিয়ে অদ্ভুত এক নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চায়। দেহতত্ত্বের এই পর্যায় পর্যন্ত সাধকের এক সচেতন প্রয়াস থাকে। অর্থাৎ তাঁর সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব এ পর্যন্ত কাজ করে। কিন্তু এর পর শূন্যতার টানে যখন তার বিচারবোধও হারিয়ে যেতে চায় তখনই সূক্ষ্ম অহংবোধ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পাছে তার ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যায় এই ভয়ে সে নিঃশেষে নিজেকে সেই মহাশূন্যের টানের কাছে ছেড়ে দিতে পারে না, আবার ব্যক্তিচেতনার মধ্যে ফিরে আসে। এই অবস্থাকে শাস্ত্রে 'মোক্ষভীতি' নাম দেওয়া হয়েছে। এই জন্যই শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ হলেন 'মহদ্ভয়ম' অর্থাৎ ব্রহ্মাণ হলেন বিরাট ভয়ের কারণ। কিন্তু ব্রহ্মাণ কাউকে ভয় করেন না। ব্রহ্মাণ ভয় করবেন কি? তাঁর তো কোন বোধই নেই। তিনি সমস্ত কিছু আত্মস্থ করে নির্বিকল্প ও নির্গুণ হয়ে আছেন। এই নির্গুণ অবস্থায় ব্যক্তিসত্তার সমস্ত বোধকে ছেড়ে দেওয়া সত্যি সত্যি বহুজনের কাছেই ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। এই জন্য খুব কম সাধকই দীর্ঘক্ষণ ব্রহ্মসান্নিধ্যে বা সমাধিতে নির্বিকল্প অবস্থায় থাকতে পারেন। অধিকাংশ সাধকই ব্রহ্ম সান্নিধ্যে থাকেন ততটুকু সময়ই যতক্ষণ একটি সরষের দানা মোষের শিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এই ব্যক্তিচেতনার অবলুপ্তি ভীতিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কেনরে এই দুয়ার-টুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।'*

কিন্তু এ সব কি তিনি সচেতনভাবে লিখেছেন অথবা পূর্ব-জন্মের সংস্কারবশে তন্ময় অবস্থাতে এসব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলা খুবই দুষ্কর। কারণ, সচেতন

---

* শূন্যতা বোধের অতীত। কিন্তু শূন্যতায় সমাধিস্থ হয়ে ফিরে এলে পরম প্রশান্তি অনুভূত হয়। এই জন্য কবি অজানার (বোধাতীতের) জয়গান করেছেন।

ভাবে এ সম্পর্কে তাঁর রচনা, যেমন 'ধর্ম' নিবন্ধ সত্যি সত্যি অধ্যাত্ম জগতে বিচরণশীল ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ও দুর্বল বলে মনে হয়। ফলে ধারণা হয় যে, পূর্বজন্মের সংস্কারই তাঁর তন্ময় মুহূর্তে ফুটে উঠে তাঁকে এমন অতীন্দ্রিয় মরমিয়াভাবে রঞ্জিত করেছে। যোগীদের কাছে শোনা যায়, ষষ্ঠ তলে এখনও রবীন্দ্রনাথ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সূক্ষ্মদেহে বিরাজমান।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শ্লোকটিও এই অর্থে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক। এর বাক্যার্থ সহজ হলেও ভাবার্থ নিতান্ত কঠিন। এবং এই ভাবার্থ বোঝা না গেলে এ-সব পাঠ করা নিরর্থক। চণ্ডীতে শুম্ভ যখন পার্বতীকে রমণীরত্ন হিসেবে তাঁকে অথবা তাঁর অনুজ নিশুম্ভকে পতিত্বে বরণ করতে বলছেন, তখন পার্বতী বা দুর্গা তাঁর জবাবে বলছেন ঃ

'যো মাং, জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি

অর্থাৎ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করতে পারবেন, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব। একথার বাহ্যিক অর্থ এই যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁকে সংগ্রামে পরাজিত করতে পারলে তাঁদের একজনকে তিনি পতিত্বে বরণ করবেন। এই কাহিনীকে যাঁরা যথার্থ অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁরা মূর্খ, তাঁদের চণ্ডীপাঠের কোন মূল্য নেই, অধ্যাত্ম জগতেও অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এর ভাবার্থই হল সত্য। ভাবার্থ হল এই: পার্বতী বা দুর্গা হলেন শক্তি—শূন্যে যিনি মুহূর্ত কালের জন্য যুক্ত থাকেন, তারপর আবার ক্রিয়াশীলা হন। সেই অর্থে নির্গুণের তিনি অন্তর্নিহিত গুণ, অর্থাৎ শূন্যের তিনি গুণস্বরূপা। গুণ হল স্ত্রীলিঙ্গ। নির্গুণের গুণ হিসেবে তিনি নির্গুণের পত্নী, যদিও চণ্ডীতে সেরকম কোন কথা বলা হয়নি, বরং তাঁকেই বৌদ্ধতত্ত্বের প্রজ্ঞার মত সর্বোত্তমা বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। কিন্তু তা কখনও হতে পারে না, এনার্জি কখনও সর্বোত্তমা হতে পারে না। একমাত্র শূন্যতাই সর্বোত্তম। এই দিক থেকে দেখতে গেলে দুর্গাও শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্মণ বা পরমাত্মণের গুণ বা স্ত্রী। এই জন্য চণ্ডীতে উল্লেখ না থাকলেও হিন্দুরা দুর্গার অন্তরালে শূন্যের প্রতীক হিসেবে এক নির্গুণ শিবকে বসিয়ে রাখেন, প্রকৃতির লীলা শেষে যেখানে তিনি মুহূর্ত কালের জন্য হলেও সুপ্তা হবেন। আসলে শুম্ভ নিশুম্ভ ও দুর্গার কাহিনী হল সাধন তত্ত্বের শেষ পর্যায়ের কথা, যখন সাধক ব্রহ্মে বিলীন হবার পথে তৃতীয় স্তরে উন্নীত হন, তখনকার কথা। এই সময় সূক্ষ্ম অহং-তত্ত্বের জন্য অনেকেই নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মে লীন হতে ভয় পান। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের মত, 'কেনরে এই দুয়ার-টুকু (শেষ বন্ধন) পার হতে সংশয়', অর্থাৎ মোক্ষ ভীতি দ্বারা আক্রান্ত হন। চণ্ডীতে সাধকের সাধন পর্যায়ে তিনটি স্তরের কথা আছে। প্রথম পর্যায়ে পশুবৃত্তি প্রবল। এই পশুত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁকে ব্রহ্মগ্রন্থি অর্থাৎ মণিপুরস্থ প্রথম গ্রন্থি অর্থাৎ শক্তির মেরুদণ্ড পথে ঊর্ধ্বগতির প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ব্রহ্মগ্রন্থিতে তমগুণ প্রবল। এই পর্যায়ে সাধকের অবস্থা মধু কৈটভের মত। এই গ্রন্থি পার করে শক্তিকে ঊর্ধ্বে অনাহত চক্র পর্যন্ত ওঠানো গেলে দ্বিতীয় বাধা পড়ে অনাহত চক্রস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থিতে। এই গ্রন্থিতে রজগুণ প্রবল। এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদের কাহিনীই মহিষাসুরবধ অংশে বিবৃত হয়েছে। এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হলে সাধকের মূলাধারস্থিত শক্তি ঊর্ধ্ব অঞ্চলে এসে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে এসে শেষ বাধা পায়। এই অঞ্চলে সাধকের সূক্ষ্ম অহংবোধ তাঁকে ব্যক্তিসত্তার সীমানা অতিক্রম করে যেতে বাধা দেয়। যদি এই শেষ ধাপ তিনি অতিক্রম করতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষভীতি অতিক্রম করতে পারেন তাহলে সপ্ততলের নানা পর্যায় বেয়ে বিন্দুর জ্যোতির্ময় অংশ ও চৈতন্যের

শেষ অংশ পার হয়ে সহজেই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ নির্গুণ শূন্যতায় শক্তিকে স্থাপন করে শক্তির ক্রিয়া নাশ করেন অর্থাৎ তিনি সমাধিস্থ হন। সমাধিস্থ হয়ে কোন সাধক নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হলে শক্তি তাঁর গুণে পরিণত হয়। এই জন্যই দেবী বলেছেন যে, আমাকে জয় করতে পারলে অর্থাৎ জগতের শক্তিপর্যায় অতিক্রম করতে পারলে সাধক আমাকে পাবেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই আমি তাঁর গুণে অর্থাৎ স্ত্রীতে পরিণত হব। সুতরাং সাধকের মোক্ষলাভের সাধনা বস্তুত জগতের শক্তিপর্যায় অতিক্রমের সাধনা। শক্তির এই স্তর অতিক্রম করার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস বা সংগ্রামের প্রয়োজন। সেই কথা মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন যে, 'এবার কালী তোমায় খাব।' এবং রসিকচন্দ্র রায় লিখেছেন 'আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।' এবং এই তত্ত্বের কথা মনে রেখেই সাধক সত্যদেব চণ্ডীকে ব্যাখ্যা করেছেন 'সাধন সমর' হিসেবে। চণ্ডীর উপর লিখিত তাঁর ভাষ্য 'সাধন সমর' নামেই খ্যাত। এই তত্ত্ব বুঝলে তবেই চণ্ডী বা ভারতের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শাস্ত্রীয় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, নস্যটেপা পাণ্ডিত্য এ-সব দিয়ে কিছু হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

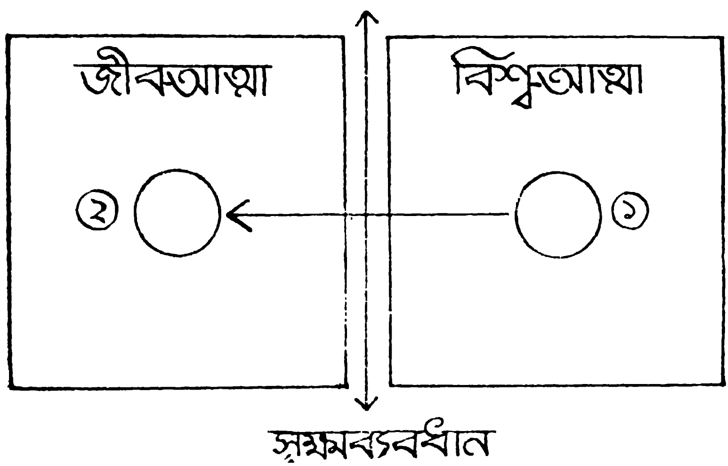
সূক্ষ্মজগতে যোগদর্শন

দিব্যজগতে প্রবেশ করে দৈবী-ভাষা অধিগত হবার আগে আত্মার স্বচ্ছদর্পণে জীবন্ত কতকগুলি চিত্র দেখা যায়। দৈবী ভাষার পূর্বস্তর হিসেবে একে বলা যায় দৈবীদর্শন। দৈবী ভাষাতে জীব ও জগতের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লেখা যায়। দৈবী দর্শনে এই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র দর্শন হয়। যোগের মাধ্যমে এই চিত্র দর্শনের পর্যায় পার হলে তবেই দৈবীসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈবীভাষার মাহাত্ম্য বোঝা যায়। এই দৈবীদর্শন কিভাবে হয় বর্তমান অধ্যায়ে সে কথাই আগে বর্ণনা করে নিচ্ছি।

দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণকালে পূর্বেই বলেছি যে, শক্তি বায়ু-তাড়িত হয়ে মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথে ঊর্ধ্ব দিকে যত উঠতে থাকে ততই মস্তিষ্কস্নায়ুতে শক্তিতরঙ্গের তারতম্য হিসেবে মানুষের নিজের অভ্যন্তরেই নানা স্তরে নানা পর্যায়ের স্বচ্ছতা অনুভূত হয়। সেই স্বচ্ছতায় তরঙ্গের সমভাব হেতু অনুরূপ তরঙ্গের নানা ছবি ফুটে ওঠে (wavelength reflects the picture of different things which correspond to the created wavelength in the Brain)। যে স্বচ্ছতার মধ্যে সমতরঙ্গের এইসব ছবি প্রতিফলিত হয় সেই স্বচ্ছতাকেই আত্মা রূপে ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাই, আত্মার স্বরূপ কি, এ ধরনের কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আত্মা হল উজ্জ্বল, আত্মা স্বচ্ছ (Life Divine গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এই উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ আত্মার আর একটি বিশেষ গুণ আছে যা সম্ভবত ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত হয়নি কিন্তু পশ্চিমী মেটাফিজিক্স-এ একে বলা হয়েছে viscous ও gluey (Sartre, Iris Murdoch, দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ এ এক ধরনের আঠা জাতীয় জিনিস। বস্তুত স্থূলজগতের

অভ্যন্তরস্থ এই উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ অবস্থা অনেকটা ফটোর নেগেটিভের মত। স্থূলজগতে যখন যে জিনিসের মধ্য থেকে তরঙ্গ (wavelength) ওঠে সেই জিনিসের অনুপাতে (proportionate to the body of the object) এই নেগেটিভসদৃশ আত্মায় তার প্রতিফলন পড়ে স্থায়ী হয়ে যায়। সম্প্রসারণশীল জগৎ স্বভাবগুণে সংকুচিত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হলে তবেই এই তরঙ্গের আনুপাতিক চিত্রগুলি মুছে যায়। নইলে আত্মার স্বচ্ছ অবস্থার নানা স্তরে ছবির মত তা ফুটে থাকে। অতীতে বস্তুজগতের যে-সব ঘটনা ঘটে গিয়ে বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে, তারও নানা পর্যায়ের তরঙ্গের আনুপাতিক ছবি কিন্তু সেই আত্মার দর্পণে ফুটে আছে। বর্তমানে যা ঘটছে তাও তরঙ্গ-অনুপাতে সেই স্বচ্ছ অবস্থার মধ্যে নিজেকে অনবরত বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে। তাৎক্ষণিক এই তরঙ্গানুপাতিক ছবির বাইরেও ব্যক্তির (প্রাণিজগতের) নানা মানসিক তরঙ্গ দেহানুপাতিক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত করে দিয়ে পরমাত্মায় কর্মফল হিসেবে তার ছবি এঁকে রাখছে। আত্মার স্বচ্ছদর্পণ পর্যায়ে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে তাঁরা এই জন্যই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদির নানা ছবি দেখতে পান। তিব্বতের লামাদের কাছে নাকি এক ধরনের স্বচ্ছ পাথর আছে, যে পাথরে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি ফুটে থাকতে দেখা যায়। আসলে তিব্বতীয় পাথর সম্পর্কে যে গল্প আছে তা যথার্থ পাথর না অন্য কিছু, সে গোপন রহস্য ভেদ হবার নয়। গুহ্যবিদ্যার গোপন কথা সাধকরা কখনই প্রকাশ করতে চান না। তাই হয়তো পাথরের গল্প করেছেন। আসলে এই স্বচ্ছ পাথর হল আত্মার স্বচ্ছদর্পণ। পূর্বেই বলেছি যে, ব্যক্তি ও বস্তুর বা বিশ্বজগতের গঠনপ্রণালী একই ধরনের। বস্তুর যদি স্থূলবন্ধনের এক প্যাঁচ খোলে তো বিশ্বেরও স্থূলবন্ধনের এক প্যাঁচ খুলে যায়। তখন দুই স্বচ্ছতার পর্যায়ের মধ্যে এক

সমান্তরাল ভাব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আত্মার সূক্ষ্ম অবস্থা ও বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থা একটা স্বচ্ছ ব্যবধানের এপার ও ওপারে থাকে। যতক্ষণ ব্যবধান ততক্ষণ ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছতার নাম আত্মন্ এবং বিশ্বের অভ্যন্তরের স্বচ্ছতার নাম ব্রহ্মণ। শেষ ব্যবধান ঘুচে গিয়ে দুইটি যখন একাকার হয়ে যায় তখন হয় পরমাত্মন্। ফলে বিশ্বাত্মায় তরঙ্গনিক্ষিপ্ত কোন ছবি জীবাত্মায় তার প্রতিসরণ ঘটায়। ঘটনাটি এই রকম ঃ ধরা যাক বহু পূর্বে পৃথিবীতে



কোন এক যুদ্ধ হয়েছে, যেমন মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের তরঙ্গজনিত প্রতিফলন বিশ্বাত্মার স্বচ্ছ অবস্থায় ফটোর নেগেটিভে ধরা ছবির মত হয়ে আছে। বিশ্বাত্মার যে স্তরে এই ছবি ফুটে আছে জীবাত্মার সেই স্তর উন্মোচিত হলে—এবং বিশ্বাত্মায় প্রতিফলিত ছবির তরঙ্গের সঙ্গে জীবাত্মার অনুরূপ স্তরের অকস্মাৎ সমান্তরালভাব হলে অর্থাৎ Correspondence of wavelength হলে জীবাত্মায় সেই বিশ্বাত্মায় প্রতিফলিত ছবির প্রতিসরণ ঘটবে। এই বিশ্বাত্মার বিশেষ কোন তরঙ্গপর্যায়ের ছবির সঙ্গে জীবাত্মার আন্তর স্বচ্ছতার নির্দিষ্ট স্তর সমান্তরাল হলেই এমন হয়।

বর্তমান লেখক সাধুসন্ত নন, ঈশ্বর দর্শনের মন নিয়ে সাধনা করেছেন, এমনও নয়। লেখকের কোন গুরু নেই। কানে একটিমাত্র ফুস্ মন্তরে মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয় এমন তত্ত্বেও বিশ্বাস করেন না। পূজা-আর্চা কোন কিছুতেই আস্থা নেই, যদিও superbeing বা অতি-জীবসত্তায় তিনি বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ দেব-দেবীতে। কারণ, দেহতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা পূর্বেই লেখক দিয়েছেন, তা প্যারাসাইকোলজিভিত্তিক। এবং সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস করার জন্য তিনি মূলাধারস্থিত সুপ্ত শক্তিকে বায়ুতাড়িত করে ঊর্ধ্বে ওঠাবার জন্য দীর্ঘ দিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছেন। এর ফলে অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। তার মধ্যে বর্তমান দর্শন, অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন সবই আছে। এ-সব যে তৈরী করে গল্প করা তা নয়, এবং এ-জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেই তা বলা হচ্ছে।* লেখকের এক সহকর্মিণী অধ্যাপিকা তখন থাকেন বরানগরে। লেখক থাকেন টালিগঞ্জে। একদিন ভোর রাতে, প্রায় তিনটে নাগাদ লেখক যখন মূলাধারস্থ শক্তি উত্তোলনের চেষ্টা করছেন—অকস্মাৎ দেখেন অধ্যাপিকাটি বিছানায় বসে ছটফট করছেন। পরদিন কলেজে যাবার পথে প্রথমেই দেখা তাঁর সঙ্গে। একই রিকশায় চলেছেন, জিজ্ঞাস করলেন, কাল রাত তিনটে নাগাদ তুমি কি বিছানায় বসে যন্ত্রণায় ছটফট করছিলে? অধ্যাপিকাটি তখন রীতিমত ক্লান্ত। অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ। কি করে জানলেন? লেখক বললেন, অকস্মাৎ আমার চোখে ছবিটি ফুটে উঠল। অধ্যাপিকাটি অবাক হলেন। তাকে নিয়ে আরো দু'একটি অভিজ্ঞতা লেখক মিলিয়ে দেখেছেন। সাধারণত এসব হয় টেলি-প্যাথি থেকে, অর্থাৎ কেউ যদি কারও সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে

* যাদের কথা বলা হচ্ছে পরিশিষ্টে আর্টপ্লেটে তাদের অনেকেরই ছবি দেওয়া হয়েছে।

যে চিন্তাতরঙ্গ উত্থিত হয়, তা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে সেই লক্ষ্যবস্তু যদি চৈতন্যসম্পন্ন হয়, তবে তার মস্তিষ্কস্নায়ুতে আঘাত করে তরঙ্গানুরূপ চিত্র ফোটাতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে বলে অধ্যাপিকাটির ধারণা নয়, অর্থাৎ সে লেখককে ভাবেনি। তাহলে কি করে তাঁর চিত্র লেখকের মস্তিষ্কস্নায়ুর তরঙ্গে ধরা পড়ল ? এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে, (১) মানুষ সচেতন মনে অবচেতন মনের কথা জানে না, যে জন্য Pascal বলেছেন 'The heart has its reason of which reason knows nothing.' অর্থাৎ অধ্যাপিকাটি অবচেতন মনে লেখকের কথা ভাবছিলেন। (২) অকস্মাৎ অধ্যাপিকাটির চিন্তা বা কর্ম-তরঙ্গের সঙ্গে লেখকের মূলাধারস্থ শক্তির উত্থান পর্যায়ের তরঙ্গ সমান্তরাল হওয়াতে এই ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ছবি যে ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। এধরনের অভিজ্ঞতা আরও অনেকের ক্ষেত্রেই লেখকের হয়েছে।

মূলাধারস্থ শক্তিকে মেরুদণ্ডপথে বায়ু তাড়িত করে তোলার সময় লেখকের আর যে-সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল নানা বর্ণ (যার কথা দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের সময়ই বলা হয়েছে) এবং নক্ষত্রখচিত আকাশ (ঘরের ছাদের নিচে বসে থেকেই), ঘূর্ণায়মান শনিগ্রহ, সূক্ষ্ম বলয়যুক্ত বৃহস্পতি গ্রহ (অধুনা যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে) সৃজনমান নতুন গ্রহ, জলপূর্ণ গ্রহ, গ্রহান্তরের উন্নত ও অবনত জীব, ঘন অরণ্য ইত্যাদি। এ-সব চিত্ত-বিভ্রান্তি বলে এক সময় লেখক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দিতেই চলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে নানা ঘটনায় এ-সবের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ পেয়ে আবার তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যান। কি প্রমাণ পেয়ে তিনি এপথ পরিত্যাগ করেননি তা পরে বলছি। সে হল ভবিষ্যৎ দর্শন।

শক্তি উত্তোলনকালে এই ধরনের নানা অভিজ্ঞতা যখন লেখকের হচ্ছিল, তখনই লেখক একদিন কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের চিত্র দেখেন।

পার্থসারথি সেখানে রথ চালনা করছেন এবং অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক শত্রুপক্ষকে দেখাচ্ছেন। পুরাণপাঠজনিত মানসিক চিত্রের প্রতিফলন বলে ধরে নিয়ে লেখক প্রথম দিকে এতে আস্থাস্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে এ-সব দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পেয়ে লেখক নিঃসংশয় হয়েছেন যে, এ দর্শনও মিথ্যে নয়। এবং যথার্থই মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রের সমর হয়েছিল। তবে এ-সব দর্শনের সবই যে সত্য তা নয়। কিছু কিছু নিজের মানসিক চিন্তারও প্রতিফলন বটে। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহাতীত হবার পথে লেখককে সাহায্য করেছিলেন বালীর ননীগোপাল ভট্টাচার্য, যিনি বেণুদা নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বেণুদা জ্যোতিষচর্চা করেন। একদিন লেখকের হাত দেখতে গিয়ে একের পর এক তাঁর এই অবিশ্বাস্য যোগদর্শনের কথা তিনি বলে যেতে লাগলেন। কি করে একটা মানুষের আন্তর দর্শনের অভিজ্ঞতা আর একটি মানুষ হুবহু বলে দিতে পারেন ভেবে লেখক অবাক হয়েছিলেন। গ্রহান্তরে একসময় লেখক শিবানীমূর্তি ও কালীমূর্তির ন্যায় (অবশ্য দ্বিপদ দ্বিহস্তযুক্ত ও শিবহীন) প্রাণী দর্শন করেন এবং অত্যন্ত দীর্ঘকায় কিছু ব্যক্তিকে দেখতে পান। বেণুদা সে সকল কথা বলে দেওয়াতে লেখকের কৌতূহল জাগে, এবং মানুষের অন্তরের মধ্যেই যে অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হন। তবুও যা কিছু সংশয় ছিল তাকে সন্দেহাতীতভাবে উবিয়ে দেয় লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কিছু দর্শন, যে-কথা এখনই বলছি, এবং কি করে এই দর্শন সম্ভব তার বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করছি। এটাই E. S. P. ব Extra Sensory Perception বা অতীন্দ্রিয় দর্শন, রাশিয়ান প্যারাসাইকোলজিস্টরা যার মধ্যে, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ দর্শনের মধ্যে wavelength তত্ত্ব খুঁজে না পেয়ে বর্তমানে দিশেহারা অবস্থায় রয়েছেন।

লেখকের তখন 'সহস্রারের পথে' বইটি কেবল বেরিয়েছে। একদিন সকালবেলা দেখেন তাঁর বাড়িতে একটি ছেলে এসে হাজির। ঠিকানা ১৬১/২সি, রাসবিহারী এভিনিউ। নাম দেবানন্দ সরকার। লেখক বললেন, কাকে চাই?

ও বলল, আপনিই কি 'সহস্রারের পথে' বই লিখেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার কাছেই এসেছি।

—কেন?

—আমার মা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

—আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?

—ভারত সেবাশ্রমে আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেখান থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।

—তোমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?

—আপনার বই সম্পর্কে মা কিছু জানতে চান? মাকে আনতে পারি?

—এনো।

—কাল আসব?

—আসবে।

ছেলেটি চলে গেল। রাত্রিবেলা লেখক যথারীতি মূলাধারস্থ শক্তিকে বায়ুতাড়িত করে ঊর্ধ্বে ওঠাবার চেষ্টা করলেন। অকস্মাৎ দেখলেন, ছোটখাটো একটি মহিলা। রং ফরসা, হাতে ত্রিশূল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অর্থাৎ শৈব সন্ন্যাসিনীরা দেখতে যে রকম হন সেই রকম। কে? কাকে দেখলেন? ভেবে যেন কূলকিনারা পেলেন না লেখক।

যথারীতি দেবানন্দ পরদিন তাঁর মাকে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করে লেখক দেখলেন যে, আগের রাতে যার ছবি দেখেছেন—ঠিক সেই মহিলা। অথচ আধুনিক মহিলা। গায়ে গেরুয়াও নেই,

হাতে ত্রিশূলও নেই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালাও নেই। তা হলে এমন এক সজ্জায় তাঁকে দেখেছিলেন কেন? তিনি ভাবতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার নাম শ্রীমতী সবিতা সরকার। মহিলাটি প্রথম প্রশ্নই করলেন, আমি আসব, আপনি জানতেন? লেখক বললেন, হ্যাঁ।

—বলতে পারেন আমি দীক্ষিতা কিনা?

—হ্যাঁ।

—কি মন্ত্রে আমি দীক্ষিত, বলুন তো?

—শৈব।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ।

লেখক বললেন, আপনার একটি রুদ্রাক্ষের মালা আছে, পরেন নি কেন?

তিনি আরও অবাক হলেন। বললেন, হ্যাঁ। আছে। লজ্জায় পরি না।

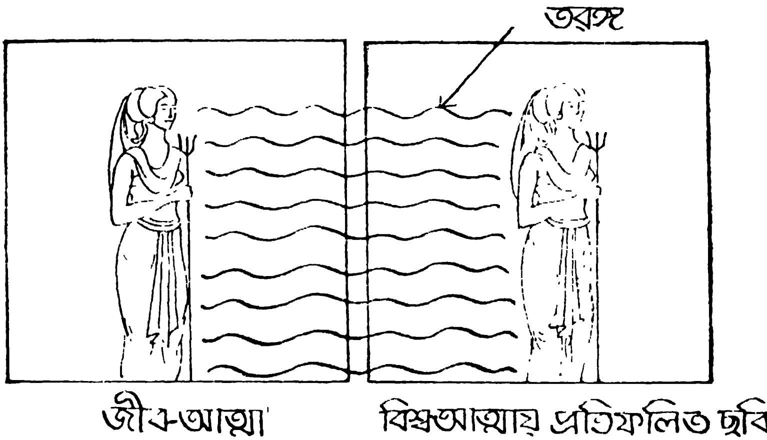
—আপনার ছোট একটি ত্রিশূলও তো আছে?

—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা পাঁচ বছর বয়সে ভারত সেবাশ্রমের একজন স্বামীজীর কাছে দীক্ষিতা। বহুদিন গুরু দেহ রেখেছেন। বয়স হবার পর অল্প কিছুদিন গুরুসান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। যতটুকু জানতে পেরেছেন, ততটুকুই সাধনা করে চলেছেন। অতীন্দ্রিয় জগতে ওঠার চেষ্টায় নানা সমস্যার সম্মুখীন তিনি। পথ পাচ্ছেন না। লেখকের বই পড়ে ধারণা হয়েছে, এ পথের হদিস তাঁর জানা আছে। লেখক তাঁকে কিছুটা পথ দেখাতে পারবেন। কিন্তু তিনি তো সাধুসন্ত নন। লোকে যাকে অধ্যাত্ম সাধনা ও অলৌকিক বলে ভাবে লেখক তাকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলে চিন্তা করেন। সুতরাং এ সম্পর্কিত লেখকের যা চিন্তা, লেখক তাঁকে বললেন এবং সহজতর পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন।

দেহতত্ত্বের অন্তর্নিহিত কার্যপ্রণালী সহজভাবে কাজ করতেই অন্তরের স্বচ্ছ দর্পণে যে ধরনের দর্শন তাঁর হচ্ছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। এখন প্রশ্ন, কি করে তাঁর এই রূপ লেখক দেখলেন? তিনি দীক্ষিতা বটে, সন্ন্যাসিনী তো নন! তাহলে ও পোশাকে তাঁকে দেখলেন কেন? সৃষ্টিরহস্যের এটাই গোপন কথা। ভারতীয়রা বলেন, এ-সব অধ্যাত্ম পুরুষদের জ্ঞাত। লেখক মনে করেন, অনুসন্ধিৎসু মনও এ গোপন রহস্যের খবর পেতে পারে। মানুষের দেহ থেকে স্বতই তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে—জৈব ও মানসিক। উভয় তরঙ্গই ফটোর নেগেটিভের মত স্থূল জগতের অন্তরালে সূক্ষ্ম ফটোর নেগেটিভের মত যে সত্তা আছে সেখানে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করছে। দেহের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের তরঙ্গ তার যে পরিণতি হতে পারে সেখানে সেই চিত্রই আঁকছে। মানসিক তরঙ্গ, মানবিক বৃত্তি অনুযায়ী ছবি আঁকছে। এ-সব ছবিই জীবের দেহানুপাতিক তরঙ্গ। বুদ্ধিমান মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গ কাজ করে। এবং তার পরিণতি জগতের অন্তরালে সূক্ষ্ম সত্তায় অনুরূপ চিত্রকল্প নিক্ষেপ করে। প্রাণি-জগতে Evolution বা বিকাশের চরম পরিণতি মানবদেহ। এজগতে তার আর কোন রূপান্তর হবে না। কিন্তু মানবেতর জীব Evolution-এর স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবে। জৈব প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি তাৎক্ষণিক। কিন্তু মানসিক তরঙ্গের ছবি কর্মফলস্বরূপ। শ্রীমতী সবিতা সরকারের মানসিক চিন্তাই তাঁকে এই স্বচ্ছ সত্তায় সন্ন্যাসিনী রূপে অঙ্কিত করে রেখেছে। হয় এজন্মে, নয়তো পর জন্মে এই মানসিক ক্রিয়া অনুযায়ী তিনি ফল ভোগ করবেন। কেউ মানসিক ক্রিয়ার ফল এ জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করবেন তা বলা যায় সূক্ষ্ম ছবির দূরত্ব দেখে। এ খুবই দুরূহ কাজ। জীবন্তরূপে দেহধারী শ্রীমতী সরকারের মানসিক প্রতিক্রিয়ারূপ তরঙ্গ

নিম্নরূপভাবে জগৎ অন্তরালের স্বচ্ছ সত্তায় তাকে প্রতিফলিত করেছে ঃ



স্থূলতার অন্তরালে সূক্ষ্মতার যে তরঙ্গে তার মানসিক ক্রিয়াজনিত প্রতিচ্ছবি পরমাত্মায় ফুটে আছে সেই তরঙ্গের সঙ্গে লেখকের চিন্তাতরঙ্গ সমান্তরাল হওয়াতেই তাঁর সেই সন্ন্যাসিনীরূপ লেখক দেখতে পেয়েছিলেন।

লেখকের বন্ধু মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে জগৎ অন্তরালের স্বচ্ছ সত্তায় জৈব দেহ ও মানসিক ক্রিয়ার প্রতিফলন ছিল নিকট ভবিষ্যতের। এবং সেজন্য লেখক ছবিটি দেখেছিলেন অনেক নিকট থেকে। মহীতোষবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। থাকেন ১৬/১, প্রতাপাদিত্য রোডে। দক্ষিণ কলকাতার একটি অধ্যাপক গোষ্ঠীর সদস্য তিনি। প্রতি মাসে ঘুরে ঘুরে এক একজন অধ্যাপকের গৃহে অধিবেশন বসে। সেবার অধিবেশন বসেছিল টালিগঞ্জ টি. ভি. সেন্টারের কাছে ডঃ প্রণব লালার ঘরে। ডঃ লালা প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সেদিন আলোচনা ছিল লেখকের। লেখক সাহিত্যের অধ্যাপক না হলেও আধুনিক কবিতার দুরূহতার অন্তরালে যে তত্ত্ব কাজ করছে সেই সম্পর্কে বলছিলেন। ফেরার পথে মহীতোষবাবুকে লেখক

তাঁর একটি ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আসুন না আমার চেম্বারে। সেই থেকে পরিচয়। এবং এই পরিচয় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে পরিণত। ইতি মধ্যে অধ্যাপক সমিতিতে হিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার উপর নানা বক্তৃতা দিয়েছি। মূলতঃ যোগ অভ্যাস অন্তর্জগতের কী গভীর রহস্য খুলে দেয় সে সবই ছিল বক্তব্য। তা শুনে মহীতোষবাবুর ধারণা হয়েছিল, যোগে আমি পারঙ্গম। এবং যোগাভ্যাস করে আমার কিছুটা শক্তি অর্জিত হয়েছে। বললেন, একদিন আমার সম্পর্কে কিছু ভাবুন না, কি হবে? অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎ কি হবে যোগবলে তাঁকে জানাতে বললেন। তখন লেখক যোগাভ্যাস করে মূলাধারস্থিত শক্তিকে মেরুদণ্ডের রন্ধ্রপথে অনেকদূর উঠিয়ে নানা জিনিস দেখতে আরম্ভ করেছেন সত্য, কিন্তু মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলার কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর হয় নি। এবং আদপেই তা বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাও ছিল না। টেলিপ্যাথিতে তখন বিশ্বাস জন্মেছিল, কিন্তু ভূত-ভবিষ্যৎ বলার বিদ্যাতে নয়। বললেন, এবিদ্যা তিনি জানেন না। তাছাড়া তিনি সাধুসন্ত নন। লেখকের এ একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা মাত্র। মহীতোষবাবু বললেন, তবু দেখবেন, যদি চোখে পড়ে।

আসলে লেখকের যে শক্তি জাগরণের তত্ত্ব বা পদ্ধতি, তা তন্ত্রশাস্ত্রের আওতার মধ্যে বোধহয় পড়ে না। এতে কোন মন্ত্র নেই, আচার বিচার নেই, শুদ্ধ অশুদ্ধ নেই, খাদ্যাখাদ্য নেই, জাত বেজাত নেই। মন্ত্রশাস্ত্রজনিত কোন ক্রিয়াই নেই এতে। উপাস্য কোন আরাধ্য দেবদেবীও নেই। চুপ করে চোখ বুজে বসে সময় কাটানোই বড় কথা। চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকলে—অন্তদৃষ্টিতে নানা সব ছবি মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে। সেই ছবিগুলো যদি গভীর মনঃসংযোগ করে দেখা যায় তাহলে মনঃসংযোগ হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত

হলেই তা সূক্ষ্ম হয়। হোমিওপ্যাথি ওষুধের Potency-র মত তখন তার শক্তি বেড়ে যায়। মূলাধারস্থ সুপ্ত শক্তিকে আঘাত হেনে সে তাকে অত্যন্ত দ্রুত উপরে তুলতে থাকে। এবং ফলে দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞান অনুসারে (দেহতত্ত্ব অংশ দ্রষ্টব্য) মস্তিষ্কস্নায়ুতে নানা তরঙ্গ ছবি ফোটাতে থাকে। কি ধরনের ছবি, রঙ, কখন আসবে, কিভাবে, তা বলার উপায় নেই। কারো উপর মনঃসংযোগ করে বসে এটা করার নয়। সুতরাং মহীতোষবাবুকে লেখক কথা দিতে পারেননি।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ অদ্ভুত এক ঘটনায় লেখক চমকে যান। তখন রাত সাড়ে সাতটা। অদ্ভুত একটা নেশায় চুপ করে বসে আছেন লেখক। মনঃসংযোগের ফলে বায়ু সূক্ষ্ম হয়ে মূলাধারস্থ শক্তিকে ঠেলে উপরে তুলছে। স্তরে স্তরে তরঙ্গ অনুযায়ী নানা জিনিস দেখছেন। অকস্মাৎ দেখেন, ফুটে উঠেছে মহীতোষবাবুর ছবি। তাঁর কথা চিন্তা না করতেও ছবি ফুটে ওঠার দুটি কারণ হতে পারে। (১) মহীতোষবাবু হয়তো লেখকের কথা ভাবছিলেন। (২) অকস্মাৎ তার জৈবসত্তাতরঙ্গ বা মানসিক তরঙ্গের সঙ্গে লেখকের দেহাভ্যন্তরের শক্তিতরঙ্গ এক হয়ে গিয়েছিল। ফলে মস্তিষ্কস্নায়ুতে অদ্ভুত কয়েকটি ছবি ফুটে ওঠে লেখকের। প্রথম ছবিতে দেখতে পান, ধুতিপাঞ্জাবি পরে তিনি চেম্বারে বসতে উপর থেকে নামছেন। হঠাৎ পড়ে গেলেন। একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলেন লেখক, স্ট্রোক্, স্ট্রোক্। কিন্তু কেমন যেন দেখতে পেলেন পেটের বায়ুতে তিনি মূর্ছা যাবার মতন হয়েছেন। তাঁকে ছোট একটি ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। চলচ্চিত্রের রিল কেটে গিয়ে যেমন নতুন ছবির অবতারণা হয় তেমনই এরপর দেখলেন নতুন এক ছবি ঃ বাড়িতে ধুমধাম করে পূজা-উৎসব হচ্ছে। তিনি প্রচুর ব্যয় করছেন। তৃতীয় আর একটি ছবিও তিনি দেখেন। তখন রাত আটটা। লেখক উঠে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ পায়ে হেঁটেই তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে

গেলেন। মহীতোষবাবু তখন ফতুয়া গায়ে, পাতলুন পরে যথারীতি তাঁর সেরেস্তায় বসে কাজকর্ম করছেন। লেখক বললেন, কথা আছে।

—বলুন।

—আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কয়েকটি দৃশ্য দেখেছি।

—কি?

লেখক যা যা দেখেছিলেন, তা বললেন। মহীতোষবাবু প্রথম দৃশ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেন না। দ্বিতীয় দৃশ্য সম্পর্কে বলতে বললেন, চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আর্থিক এত টানাটানি চলছে যে, তা সম্ভব বলে মনে হয় না। তৃতীয় দৃশ্য সম্পর্কে বললেন, তার পরিণতি হিসেবে লেখক যে ধরনের ছবি দেখেছেন সে রকম হবার কোন সম্ভাবনা নেই। লেখক বললেন, এরকম সব ছবিই তিনি দেখেছেন। তবে তা তাঁর নিজের মনের কল্পনা-প্রসূত কিনা তিনি জানেন না। যা দেখেছেন, তাই তাঁকে জানালেন।

সপ্তাহ্খানেক পরের ঘটনা। মহীতোষবাবুর লেখকের কাছে আসার কথা ছিল। তিনি আসেননি। ফলে লেখকই একদিন তাঁর কাছে গেলেন। বললেন, কই গেলেন নাতো?

তিনি বললেন, শরীরটা বড় খারাপ ছিল।

—কি হয়েছিল?

বললেন, নিচে নামার সময় হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। লেখক বললেন, আমিতো আপনাকে আগেই বলে গিয়েছিলাম! হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন, আশ্চর্য! আমার মনেই ছিল না। সত্যি সত্যি সেদিন ধুতি পাঞ্জাবি পরেই সেরেস্তাতে নামতে যাচ্ছিলাম। সাধারণত আমি ফতুয়া পাতলুন পরেই নামি।

আর ঠিক সে-রকম ধারণাই হয়েছিল যে, স্ট্রোক হয়েছে। কিন্তু কার্যত পেটে বায়ু থেকেই ওরকম হয়েছিল। ঠিক সেই ছোট ঘরের খাটটাতেই আমাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে ?

—তাহলে ? দ্বিতীয় যে ছবিটা দেখেছিলেন ? অর্থাৎ পুজো ?

লেখক বললেন, অপেক্ষা করুন। দেখা যাক।

আশ্চর্য ! তার দু'মাস পরেই বাসন্তীপুজো। মহীতোষবাবু, সে পুজো করলেন মহাধুমধাম করে। প্রচুর ব্যয়ও করলেন।

ফলে তৃতীয় যে ছবিটি লেখক দেখেছিলেন, একটি বিরোধকে কেন্দ্র করে, তা যাতে লেখকের দেখা পরিণতির দিকে গড়াতে না পারে মহীতোষবাবু তার ব্যবস্থা করলেন। তাড়াতাড়ি বিরোধ মিটিয়ে নিলেন। সেই থেকে মহীতোষবাবুর ধারণা, লেখকের মধ্যে একটা দৈবীসত্তা ফুটে উঠেছে। প্রতি কাজেই তাঁর পরামর্শ চান। কিন্তু লেখক এর মধ্যে দৈবীসত্তার কোন প্রকাশ আছে বলে মনে না করে অধিমনোবিজ্ঞানের সূত্র ক্রিয়াশীল রয়েছে বলে ভাবেন।

মহীতোষবাবু সম্পর্কে এই যে দেখা, সেও রাশিয়ান অধি-মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা মত wavelength ঘটিত ব্যাপার। তাঁর প্রথম দেখা চিত্রটি দেহাভ্যন্তরস্থ জৈবী-সত্তার রোগজনিত তরঙ্গের জাগতিক সূক্ষ্ম অংশে ফটোর নেগেটিভসদৃশ স্বচ্ছতায় প্রক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি মাত্র। দ্বিতীয় ছবিটি মানসিক চিন্তাতরঙ্গ বিচ্ছুরিত ছবি। তৃতীয় ছবিটিও তার কর্মতরঙ্গ ও চিন্তাতরঙ্গের সমন্বয়ে জগৎসত্তায় ধরে রাখা প্রক্ষিপ্ত চিত্র। বস্তুত সকল ছবিই তো এক ধরনের তরঙ্গনিক্ষিপ্ত রূপরেখা। সিনেমার পর্দায় যে ছবি ফোটে তার উৎস পর্যালোচনা করলেই এই তরঙ্গের খেলা অনুভব করা যাবে। এক এক ছবির ক্ষেত্রে আলোর মধ্য দিয়ে যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয় তা আর একটি ছবির ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত তরঙ্গের সঙ্গে পৃথক। অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি এক একটি ছবির

ক্ষেত্রে এক এক ধরনের। এবং লেখকের তত্ত্ব সত্য বলেই যা স্থূল ছবিতে ফোটেনি জগতের সূক্ষ্ম সত্তায় তার প্রতিফলন লেখকের দেহ-জাত ঊর্ধ্বগতি শক্তিতরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরাল হবার জন্যই ফুটেছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও রশ্মিতত্ত্ব অনুযায়ী **wavelength**-এর সমান্তরাল অবস্থান হেতুই হয়ে থাকে। জগতের স্থূল দৃশ্যের অন্তরালে সূক্ষ্ম একটা **viscous** জাতীয় সত্তা আছে, যেখানে জীবের দেহানুপাতিক তড়িৎফ্রিকোয়েন্সি ছবির আকারে তাঁকে অঙ্কন করে রাখে। সেই অঙ্কিত চিত্রটিরও নিজস্ব একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। মানুষের দেহের মূলাধারস্থ শক্তির আরোহ পর্যায়ে বিশেষ ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি যখন সেই সূক্ষ্ম চিত্রের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে সমান্তরাল হয়, তখন জৈবিক বা মানসিক ক্রিয়াকলাপসঞ্জাত ফ্রিকোয়েন্সির প্রক্ষেপণ তাকে জাগতিক সূক্ষ্ম সত্তায় যেভাবে নিক্ষিপ্ত করে, সেই প্রক্ষিপ্ত ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে কোন ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরস্থ শক্তি-তরঙ্গ সমান্তরাল হলেই অদৃশ্য সেই ছবি সে দেখতে পায়। অদৃশ্য এই ছবিগুলি জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে হয় ভবিষ্যৎ হয়ে ফুটে আছে নয়তো তার অতীতে ফুটে থাকা কর্মের চিত্রস্বরূপ অঙ্কিত হয়ে আছে। ইহজীবনের অতীত চিত্রও সেখানে ফুটে থাকে। পূর্বজন্মের অতীত চিত্রও ফুটে আছে। ইহজীবনের অতীত চিত্র যদি ব্যক্তির স্মৃতিতে জীবিত থাকে তাহলে সে চিত্র দেখে তাকে কিছু বলা গেলে তিনি তাতে আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু পূর্বজন্মের ছবির কথা তাঁর বিশ্বাস নাও হতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কথাও বিশ্বাস না হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। ভবিব্যদ্বাণী যদি ফলে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাকে এক ধরনের দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করতে আরম্ভ করে, এবং বক্তাকে সাধকের আসনে বসিয়ে পুজো দিতে থাকে। কিন্তু এর অন্তরালে যে একটি অতি সূক্ষ্ম, বৈজ্ঞানিক

প্রথা কাজ করছে সে সম্পর্কে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না।

শুধু মহীতোষবাবু নন, তাঁর বৌদি শ্রীমতী স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এই ভবিতব্য অদ্ভুতভাবে লেখকের সূক্ষ্ম চেতনাতরঙ্গে এক সময় ধরা পড়েছিল। এক সময় তাঁর একমাত্র মেয়ে বুবাই সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চিন্তায় ছিলেন। মেয়ের ভাগ্য সম্পর্কিত একটি ফলাফল তখন দোদুল্যমান অবস্থায় চলছে। একদিন মিসেস চ্যাটার্জী লেখককে বললেন, প্রফেসর সরকার, একবার দেখবার চেষ্টা করুন না কি হবে?

লেখক বললেন, চেষ্টা করব। তবে কখন কিভাবে যে এ-সব চিত্র মস্তিষ্কস্নায়ুর তরঙ্গে ছবির আকারে দেখা দেবে বলা দুষ্কর। যদি অকস্মাৎ কখনও সে চিত্র ফুটে ওঠে, বলব। আশ্চর্য! দু'একদিনের মধ্যেই লেখক যে ছবি দেখলেন সে আর এক অদ্ভুত ধরনের ছবি—যে ছবিকে প্রতীকী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ প্রতীকী ভবিষ্যৎ, Symbolic future. লেখক দেখেন, মেয়ের যে সুখবরের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, সে খবর এসেছে। মেয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মা দাঁড়িয়ে। মেয়ে গিয়ে সুখবর দিতেই তিনি চারদিকে মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে থুতু ফেলতে লাগলেন। মিসেস চ্যাটার্জীকে লেখক তাঁর দেখা ছবির কথা বললেন। তিনি বললেন, সে কি কথা! মেয়ের সুখবর পেয়ে আমি থুতু ফেলবো কেন?

তখনও মিসেস চ্যাটার্জী জানতেন না যে, সেই সুখবরকে কার্যে পরিণত করার জন্য কি দুঃসহ সমস্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগুতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই সুখবরটি আসাই ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেই অসম্ভবও একেবারে শেষ মুহূর্তে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাকে শেষ পরিণতিতে টেনে নেবার জন্য যে চেষ্টার দরকার সেই চেষ্টাটুকু করতে গিয়ে মিসেস চ্যাটার্জী একেবারে

হিমসিম খেলেন। ‘সুখবর’ তার শেষ পরিণতি পেল একেবারে eleventh hour-এ। যেন পাণিপথের যুদ্ধ জয় করে ক্লান্ত বিধ্বস্ত তখন মিসেস চ্যাটার্জী। জয়ের আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে অবসাদ। বললেন, ওহ্! আপনার সার্থক দেখা অধ্যাপক সরকার। আমার একেবারে জেরবার হয়ে গেছে। তিতিবিরক্ত হয়ে থুতুই ছিটোতে হয়েছে।

সূক্ষ্ম জগতের এই রহস্যটাই অদ্ভুত। যদিও ভূত ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ছবি wavelength-এর ভিত্তিতেই কাজ করে, তবু এই সব তরঙ্গ অনেক সময় এমন সব symbolic picture ছুড়ে দেয়, যেগুলি রীতিমত হেঁয়ালী। ফ্রয়েড স্বপ্নতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তব্যকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখেছেন। সেই ফ্রয়েডীয় দর্শনের ভিত্তিতেই কাব্যে ও ফিল্মে প্রতীকময় অধিবস্তুবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। টি. এস. এলিয়টের কথায়—মনের আকাঙ্ক্ষা চেতনার প্রহরীকে এড়িয়ে বার হবার সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে। সেই ছদ্মবেশ অদ্ভুত symobic. আমরা যাকে দৈবীজগতের ক্রিয়াকলাপ বলে মনে করি, তাও আনেক সময় অদ্ভুত প্রতীকের ছবিতে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন হয়েছিল মিসেস চ্যাটার্জীর ক্ষেত্রে। তবে এই হেঁয়ালী অত্যন্ত বেশি রকমে কাজ করে প্রতীকময় ভাষাতে, যে কথা বর্তমান অধ্যায়ের পরেই আসছে। বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্য হল জীবাত্মার স্বচ্ছ সত্তায় জাগতিক সমান্তরাল স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত চিত্র দর্শন—যে স্বচ্ছ সত্তাকে তিব্বতী লামারা স্বচ্ছপাথর বলে বর্ণনা করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছেন। কারণ, এই দর্শনক্ষমতাকে তাঁরা ভাগবৎ ক্ষমতাপ্রসূত বলে মনে করেন এবং একে গুহ্যতত্ত্ব (esoteric knowledge) হিসেবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রাখতে চান। কিন্তু বর্তমান লেখক একে অধিমনোবিজ্ঞানের একটি সমীক্ষাক্ষেত্র বলেই মনে

করেন। অধিমনোবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে যে-সব বিষয়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা হল—Telepathy (কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যম ছাড়াই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চিন্তাতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া) clairvoyance (মানুষের কাছে অজ্ঞাত ঘটনা সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) Psychometry (কোন অদৃশ্য ব্যক্তি বিষয়ে তার ব্যবহৃত সামগ্রী দেখে তার সম্পর্কে বলা), Pre-recognition (এতে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা যায়) Psychokinesis (মানসিক শক্তিবলে বস্তু নাড়িয়ে দেওয়া) Teleportation (এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা), Lavitation (ভূমি থেকে ঊর্ধ্বে ওঠা) Psychic healing (আত্মশক্তিবলে রোগ নিরাময় করা) Materialisation (শূন্য থেকে ইচ্ছাশক্তি বলে বস্তু তৈরী করা) Out of the body projection (অর্থাৎ স্থূল দেহ থেকে সূক্ষ্ম সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে আকাশপথে পরিক্রমা।। এ-সব তত্ত্ব নিয়ে পশ্চিমী জগতেও আজ তোলপাড় ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও তাঁদের এমন ত্রুটি রয়েছে, যে জন্য অলৌকিক কতকগুলি অভিজ্ঞতা হলেও তার যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি তা তাঁরা ধরতে পারছেন না। আবার এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করে কেউ কেউ বা রীতিমত প্রতারণা করবার চেষ্টা করছেন, বা মহাপুরুষ সেজে প্রতারণার পথ ধরেছেন।

অধুনা ইউরোপীয়রা প্যারাসাইকোলজির নামে যে জগতে প্রবেশ করে দিশেহারা অবস্থাতে আছেন সে অবস্থা ভারতীয়রা অনেক আগেই অধিগত করেছিলেন। এবং মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এগুলি যে একধরনের অন্তরায় তা বুঝে বহু পূর্বেই এসব পরিত্যাগ করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সত্যকে জানা। বিশ্বের উৎস কোথায়, সত্য কোথায়, তা জানার জন্যই তাদের অভিযাত্রা। শেষ পর্যন্ত সেই সত্যকে তারা জেনেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন যে, সবই সত্য, জীব, অজীব, সব। অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে

অর্থাৎ স্থূলতার খোলস খুলে ফেললে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। কিন্তু সে-সব কথা থাক। যে কথা বলা হচ্ছিল তাই বলা যাক। অর্থাৎ দৈবী-ভাষার জগতে প্রবেশের পূর্ব পর্যায়ে দৈবদর্শনের জগতের কথা। প্রতীকময় দৈবীভাষার জগতে প্রবেশ করার আগে অদ্ভুত এক দৈবীদর্শন হয়—যে দৈবী দর্শনের কথা শ্রীমতী সবিতা সরকার, মহীতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মিসেস চ্যাটার্জীর প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন। এ ব্যাপারে লেখকের আরও চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল শ্রীযুক্ত রথীন রায় প্রসঙ্গে। শ্রীযুক্ত রায় থাকেন টালিগঞ্জ-হাউসিং এস্টেট, নেতাজী সুভাসচন্দ্র রোডে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় বহুদিন। সরকারী চাকুরে। ভারত সেবাশ্রম থেকে দীক্ষিত। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় লেখকের একটি বক্তৃতা শুনে ভারত সেবাশ্রমে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর ধারণা, অধ্যাত্মজগতে লেখকের কিছু প্রবেশাধিকার হয়েছে। প্রায়শই লেখকের কাছে আসেন। চাকরিতে পদোন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন, অথচ হচ্ছে না। একদিন লেখককে বললেন, দেখুন না, কিছু যদি চোখে পড়ে। এই চোখে পড়া বিদ্যাটিই লেখকের জানা নেই, কাকচরিত্রই বলুন আর জ্যোতিষশাস্ত্রই বলুন। লেখক বললেন, আমি তো কিছু জানি না, যদি কখনও চোখে পড়ে।

আশ্চর্য, একদিন রাত্রিবেলা বসে লেখক দেখতে পেলেন, মাঝারি উচ্চতার কৃষ্ণবর্ণ এক ভদ্রলোক রথীনবাবুকে বাঁ পাশে নিয়ে যেন সিঁড়ি ভেঙে লেখক যে ঘরে বসেন সেখানে উঠছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দও কানে ভেসে এল—three, three, three. লেখকের অন্তস্তল থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ব্যাখ্যা চলে এল ছবিটির, অর্থাৎ, রায় যে পদোন্নতি খুঁজছেন, অনুরূপ বর্ণনার ভদ্রলোকের সাহায্যেই তা পাবেন। এবং তিন মাসের মধ্যেই তা হবে। দ্বিস্তর সিঁড়ির ধাপ ভেঙে তিনি উপরে উঠেছিলেন,

সুতরাং এমন অফিসে তাঁর প্রমোশন সহকারে বদলি হবে যে-অফিসে দ্বিস্তর সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। তিনি সাধারণত প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরতেন। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠাকালে তাঁর গায়ে ছিল বিশেষ ধরনের uniform.

অকস্মাৎ পরদিন রথীনবাবু এসে হাজির। লেখক তাঁকে বললেন, এমন কোন লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে? তিনি অবাক হয়ে বললেন, আপনি জানলেন কি করে? কেউ জানে না।

লেখক বললেন, এই লোকের সাহায্যে তিন মাসের মধ্যে আপনার প্রমোশন হবে। এই ধরনের পোশাক আপনাকে পরতে হবে। দ্বিস্তর সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে অফিসে বসবেন। রথীনবাবু বললেন, গোপনে পরীক্ষা দিয়েছি। কেউ জানে না। তিন মাসে রেজাল্ট বেরুবে। পাস করতে পারলে প্রমোশন। আর আপনি যে ধরনের অফিসের কথা বলছেন তা একমাত্র বেহালাতেই আছে।

আশ্চর্য! তিন মাসের মধ্যেই সেই নির্দিষ্ট অফিসে দ্বিস্তর সিঁড়ি ভেঙে বর্ণনানুগ পোশাক পরে রথীনবাবুকে পদোন্নতি নিতে হল।

এর পর অকস্মাৎ আর একদিন রথীনবাবুকে লেখক দেখলেন, সেই ভদ্রলোকের পাশে আবার তাঁর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছেন। সিঁড়ির ধাপ ছ'টি। একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লেখককে যেন বলে দিল, ছ'মাসের মধ্যে রথীনবাবুর আবার প্রমোশন হবে। ঠিক তাই। ছ'মাস পরেই আবার তাঁর প্রমোশন হল। যে তত্ত্বের ভিত্তিতে জাগতিক সূক্ষ্ম সত্তায় মানুষের জৈব ও মানসিক চিন্তা-তরঙ্গ প্রক্ষেপ সৃষ্টি করে, চিত্র অঙ্কন করে, এও যে ঠিক সেই তত্ত্বের ভিত্তিতেই হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপরোক্ত তত্ত্ব শুধু দর্শন সম্পর্কেই যুক্ত নয়, শক্তির এই উত্থান পর্যায়ে মানুষের মধ্যে এর ফলে একধরনের শক্তিও জন্মে। যাকে বলা যায়

willforce বা ইচ্ছাশক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে অনেক কিছুই করা যায়। এর ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন উরি গেলার। (পরিশিষ্টে চিত্র দ্রষ্টব্য)

ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে যে এমন হতে পারে, এটা লেখক পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই ইচ্ছাশক্তিই ভারতীয় সাধুসন্তদের করায়ত্ত আছে বলে হাজার হাজার লোক তাঁদের সান্নিধ্যে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। তবে ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়েছে এমন সাধুসন্তের সংখ্যা কম, কদাচিত দেখা যায়। চল্লিশ বছর পদ্মাসনে বসে হৃষীকেশে সাধনা করেছেন, এমন এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেহালায়। সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত। কিন্তু এই চল্লিশ বৎসরে মানুষের স্থূল দেহবন্ধনের অন্তরালে যে 'অনন্ত অসীম' বিরাজ করছে, তার কোন সন্ধানই তিনি পাননি। অথব তাঁর শিষ্য সামন্তের অভাব নেই। এ ধরনের অপদার্থের সংখ্যা কম নেই। যাকে এঁরা আত্মতত্ত্ব বলেন, সেই আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এঁদের কারোরই নেই। না থাকার কারণ, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি নির্ভেজাল আত্মসমর্পণ এবং প্রশ্ন করার স্পর্ধাহীনতা। মানুষ নিজেই যে এক ধরনের স্রষ্টা, ভগবান অপেক্ষা সে কোন অংশে কম নয়, একথা তারা জানে না। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকি সম্পর্কে ব্রহ্মার বক্তব্য যে কতদূর সত্য, সাধারণ মানুষ তাতো বোঝেই না, সাধুসন্তরাও বুঝতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বলেই লিখেছেন ঃ

'যা রচিবে তাই সত্য তুমি
কবি তব মনভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন।'

সত্যি সত্যি কবি যদি মানসক্ষেত্রে রামায়ণকাহিনী তৈরি করেন, জাগতিক সূক্ষ্ম সত্তায় জীবন্ত হয়ে তা ফুটে থাকতে পারে।

প্রতিটি মানুষের প্রতিটি চিন্তাই জাগতিক সূক্ষ্ম সত্তায় চিত্র হয়ে ফুটে আছে, খারাপ চিন্তাই হোক, আর ভাল চিন্তাই হোক। শক্তিজাগরণপ্রয়াসী ব্যক্তিরা অনেকেই তাই চৈতন্যসত্তাকে উত্তোলন কালে নানা ধরনের ছবি দেখে থাকেন—যে ছবিগুলো তাদের কাছে অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত মনে হয়। এর কারণ, তাঁরা নিজেরা এধরনের কোন চিন্তা কখনও করেছেন বলে তাঁদের মনে পড়ে না। যে পটভূমিতে এই দর্শন হয় তা দর্পণসদৃশ। সেই স্বচ্ছদর্পণ সদৃশ অবস্থাকেই লালন ফকির বলেছেন 'আর্শিনগর' আর তিব্বতী লামারা বলেছেন 'স্বচ্ছপাথর'।

এই স্বচ্ছ পাথরে বা আর্শিনগরে যে শুধু জীবের তরঙ্গজনিত প্রতিফলনই দেখা যায় তা নয়, স্থূলদেহান্তে জীবাত্মার অবস্থানও হয় এই সূক্ষ্ম জগতে। ফলে এই আর্শিনগরে যাদের প্রবেশাধিকার হয়েছে, তারা স্থূলদেহ শেষে মানুষের সূক্ষ্ম অস্তিত্বও সেখানে দেখতে পান। এক্ষেত্রেও অদ্ভুত এক তত্ত্ব কাজ করে। এ তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল রয়েছেন ভারতীয় অধ্যাত্মবিদেরা।

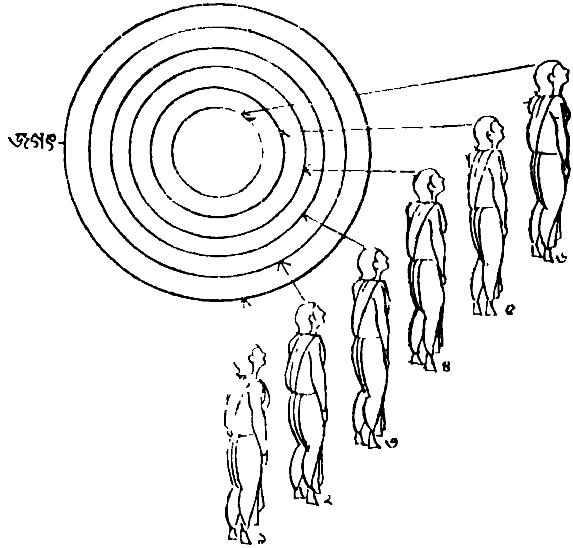
ভারতীয় অধ্যাত্ম পুরুষেরা পরমাত্মার উপর ছটি (কারো মতে পাঁচটি) আবরণে আবদ্ধ জীবরূপে স্বতন্ত্র সত্তার কল্পনা করেছেন। ঘটনাটি এই ধরনের—শূন্যস্থিত শক্তি স্বভাবগুণে বিস্ফোরিত হলে নানা তরঙ্গে গোলাকার (কিছুটা ডিম্বাকৃতি) অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় অধিমনোবিজ্ঞানে বা তন্ত্রমতে এই বিস্ফোরণের ফলে সম্প্রসারণশীল আকৃতি গোলক একান্নটি কোয়াণ্টাম পদ্ধতিতে অর্থাৎ ধাপে ধাপে ছড়িয়ে পড়ে। একান্নতম ধাপে শক্তির ফ্রিকোয়েন্সিহেতু তা অণুর বা পরমাণুর রূপ নেয়। তাদেরই পারস্পরিক যোগাযোগে স্থূল বস্তুসত্তার উদ্ভব হয়। এই বস্তুসত্তা তার শেষ ভাগ থেকে আবার উৎসে ফিরে যাবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়, অর্থাৎ বিস্ফোরণের শক্তি যখন শেষ হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের টানে দ্রুত অভ্যন্তরমুখী

হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় centripetal force নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জগতের গোলাকার পরিধির প্রান্তভাগে ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে তাতে মনুষ্য জাতীয় জীব আত্মপ্রকাশ করে। তারা স্থূলজগৎ centripetal force-এর টানে লয় প্রাপ্ত হবার আগেই আপন আন্তর সত্তায় জগৎরহস্যের মূল সূত্র ধরতে পেরে জেনে যায় যে, জগতে প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যেই জগৎব্রহ্মাণ্ডের লীলা স্তব্ধ হয়ে আছে। শক্তির বিচ্ছুরণ হলে সেই ক্রিয়া আবার ফুটে ওঠে। মানুষ দেহতত্ত্বের মধ্যে সেই সত্য আবিষ্কার করে জগতের উৎসের সন্ধান পেয়েছে, যে সত্য সন্ধানের কাহিনী বর্তমান পুস্তকের দেহতত্ত্ব অংশে লেখক বিবৃত করেছেন।

অণুপরমাণু থেকে জীব ও মানুষ সব কিছুতেই জগৎসৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নানা স্তর ভেতরের শূন্যতাকে আবরিত করে আছে। এই আবরণ একে একে সরে গেলে ভেতরের অনন্ত শূন্যতা তার স্বরূপে ফিরে যায়। যেমন পেঁয়াজের শেষ খোলা সরে গেলে অন্তস্থ শূন্যতা বাইরের শূন্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলে যায়।

তন্ত্রমতে শক্তির একান্নতম ধাপে জগৎ। দেহতত্ত্বে এই একান্ন ধাপ সপ্তস্তরে বিভক্ত। এর মধ্যে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বস্তুস্তর রয়েছে ছটি। তার তন্মাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুকরণ রয়েছে সপ্ততলে। সপ্ততলের শেষ পর্যায়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে কিছুই নেই, রয়েছে শুধু মহাশূন্যতা। স্থূলতা হল তরঙ্গের হেরফের হেতু। সূক্ষ্মতাও তাই। যত স্থূল, frequency তত কম। যত সূক্ষ্ম ফ্রিকোয়েন্সি তত বেশি। আলোর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি যেমন দৃশ্যমান, অতিরিক্ত ফ্রিকোয়েন্সি তেমনই অদৃশ্য। তেমনই বস্তুসত্তার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট একটি ফ্রিকোয়েন্সিই বস্তু রূপে বিরাজমান, বেশি হলে সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থিতিমান যা স্থূলদৃষ্টি দ্বারা দর্শনযোগ্য নয়। জীবের ক্ষেত্রে এই ফ্রিকোয়েন্সি তার কামনা বা বাসনা। যত

কামনা বেশি, ততই তার ফ্রিকোয়েন্সি স্থূল, ততই সে স্থূলতার ভারে আচ্ছন্ন। এই ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে জীবকে ব্যাখ্যা করলে তাকে সাগরে নিমজ্জিত একটি জাহাজ বলে প্রতীয়মান হবে। মালপূর্ণ জাহাজের অধিকাংশই জলের নিচে থাকে। জাহাজ হালকা হলে একমাত্র নিচের অংশ ছাড়া আর সব অংশ উপরে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। যত তার কামনাবাসনার ভার ততই তার নিমজ্জন, যত কামনাবাসনা কম, ততই তার লঘুতা। লঘুতা হলেই তার উচ্চমার্গ বা স্তর। ডায়াগ্রাম আঁকলে ছবিটি দাঁড়াবে এইরকম ঃ

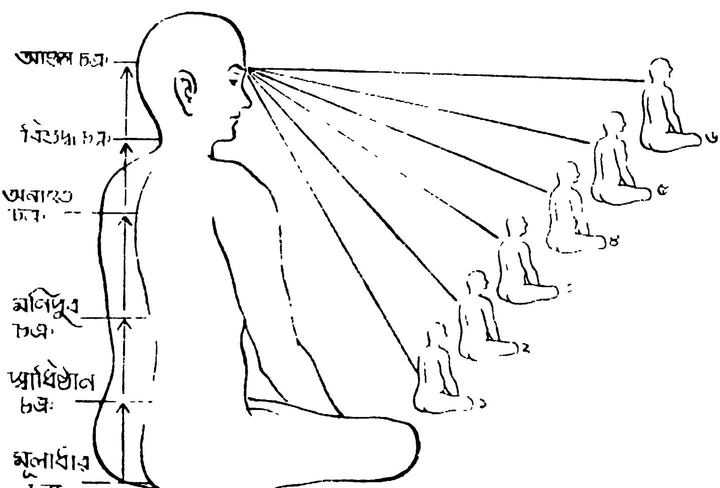


চিত্র অনুসারে প্রথম দিকের মানুষ কামনা-বাসনাভর্তি। ফলে জগৎসমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে আছে। মৃত্যুর পর জগৎ পর্যায়ের প্রথম স্তরে সে ঘোরাফেরা করে, অর্থাৎ মূলাধার স্তরে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষের বাসনাকামনা আর একটু কম। মৃত্যুর পর তার দেহের সূক্ষ্ম অংশ কামনাবাসনার তুলনামূলক লঘুতাহেতু স্বাধিষ্ঠান

পর্যায়ে ভাসমান থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের মানুষ, অর্থাৎ যার কামনাবাসনা আরও কম, মৃত্যুর পর তার সূক্ষ্ম দেহের লঘুতা আরও বেশি। সে তার সূক্ষ্ম দেহে সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় স্তরে হালকা হয়ে ভাসতে থাকে। ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী এই তিন স্তর পর্যন্ত পার্থিব জগতের অভিকর্ষ অত্যন্ত বেশী। ফলে এই সব স্তর থেকে সূক্ষ্ম দেহগুলি অতি তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে নেমে এসে জন্ম নেয়। এসব আত্মা জলভরা মেঘের মত বেশিক্ষণ ভাসমান থাকতে পারে না। জলভরা মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে তেমনই কামনাবাসনার ভার ঘনীভূত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই এই তিন স্তরের আত্মাকে ভারি করে তোলে। পুনরায় তারা পৃথিবীতে ঝরে পড়ে অর্থাৎ নতুন করে জন্ম নেয়। চতুর্থ পর্যায়ে যারা ওঠে তারা অনেকটা কম কামনাবাসনা দ্বারা আক্রান্ত। এরা চতুর্থ স্তরে বেশ কিছু দিন বিরাজ করে। এখানে অনেকটা শান্তভাবে থাকে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত নিম্নস্তরের আত্মারা স্থূলদেহের অভাবে কামনাবাসনা দ্বারা পীড়িত হয়ে কষ্ট পায়। চতুর্থ পর্যায়ে যে আত্মা যেতে পারে (আত্মা মানে সূক্ষ্ম দেহ) সে কিছুদিন শান্তিতে থাকার পর অবচেতন কামনাবাসনা পুনরায় ফুটে উঠতে থাকলে, সূক্ষ্ম দেহে ভারপ্রাপ্ত হয় ও অবশেষে জলভরা মেঘের মত একদিন নিচের দিকেই ঝরে পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলে সাধারণত সাধুসন্তপ্রকৃতির লোকদেরই দেখা যায়। এরাও একদিন পৃথিবীতে নামেন—তবে বিলম্বে, কারণ, এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কামনাবাসনা এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজ আকারে থাকে, যে, তা ফুটে উঠতে সময় লাগে। সপ্ততলে জ্যোতির্ময় আকারে কিছু প্রাণী দেখা যায়, সম্ভবত এঁরাই পৃথিবীতে হিন্দুদের মতে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে অবতরণ করেন।

জীবাত্মা খুবই ছোট বলে অনেকে মনে করেন। কারো মতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, কারও মতে অনুতুল্য। আসলে জীবাত্মা স্থূল

দেহেরই পরিমাণস্বরূপ। এ হল এক ধরনের সূক্ষ্ম পরমাণু দিয়ে তৈরি—বিজ্ঞান যাকে Ectoplasm নামে অভিহিত করতে চায়। এই ধুঁয়াকৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ স্থূল নজরে দৃষ্ট হয় না। ওজনে হাল্কা। মৃত্যুর পর জল যেমন ডুবন্ত দেহকে ঠেলে ওপরে তোলে তেমনই কোন একটা কিছু যেন সেই সূক্ষ্ম সত্তাকে ভাসমান করে উপরে তুলে দেয়। কামনাবাসনা যার যত কম তার সূক্ষ্ম দেহ ততই লঘু, এবং মৃত্যুর পর লঘুতার পরিমাণ হিসেবে এক এক জন এক এক স্তর প্রাপ্ত হয়। কেউ যদি তার মূলাধারস্থ সুপ্ত শক্তিকে সূক্ষ্ম বায়ুর দ্বারা তাড়িত করে স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বে উঠাতে পারেন, তবে তিনি সেই সেই স্তরে কখনও কখনও সূক্ষ্মাত্মাসমূহের তরঙ্গের সমান্তরাল পর্যায়ে এলে তাঁদের দেখতে পান। বর্তমান লেখকের এমন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। যোগসাধনকারী ব্যক্তি জীবাত্মার দর্শন পান বিভিন্ন স্তরে এইভাবে:



কোন শক্তি উত্তোলনকারী ব্যক্তি মূলাধারস্থ শক্তিকে যে স্তরে ওঠান সেই স্তরের আনুপাতিক যে তরঙ্গ তা তাঁর মস্তিষ্কস্নায়ুতে

আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে সেই সেই ফ্রিকোয়েন্সির সমান্তরাল ফ্রিকোয়েন্সির বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্মদেহী প্রাণীকে তাঁর তৃতীয় নয়নে অর্থাৎ মস্তিষ্কতরঙ্গে টি. ভির পর্দায় দেখা ছবির মতন ফুটিয়ে তোলে এবং সূক্ষ্ম দেহের যে অস্তিত্ব আছে বর্তমান ইউরোপীয় পাশ্চাত্য প্যারাসাইকোলজি বিভিন্নভাবে তার সন্ধান পেয়েছে। এবং দেহের ঊর্ধ্বে অদৃশ্য সেই সত্তা যে আলোর তরঙ্গ হিসেবে ফটোর চোখে ধরা পড়ে—কার্লিয়ান ফটোগ্রাফি বা কির্লিয়ান ফটোগ্রাফি নিশ্চিন্তভাবেই সেই সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। (কভারের পিছন দিকের ছবি দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশের পর দিব্য সংকেতময় ভাষা

দেহতত্ত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। দেহতত্ত্বে মূলাধারস্থ শক্তি কোন্ কোন্ স্তরে উঠলে কি কি রঙ ও দৃশ্য দেখা যায়, তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই দর্শনপর্যায়ের চিত্র আকস্মিক দর্শন রূপে দেখা দেয় মাঝে মাঝে নিম্নস্থ তিনটি পর্যায়ে (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দর্শনগুলি হয় পার্থিব দর্শন—Telepathy ধরনের। কখনও কখনও কিছু অলৌকিক ছবি উঁকি দিয়ে ঊর্ধ্ব স্তরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। নানা দর্শন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হতে থাকে অনাহত চক্রমণ্ডল থেকে আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত। এ-সময়ের দর্শন সাধারণত আকাশে স্থিত গ্রহগ্রহান্তর ও জগতের সূক্ষ্মতলে অবস্থিত সূক্ষ্মাত্মাদের। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দৈবীসত্তার সাক্ষাৎও মেলে। এঁরা জীবন্তরূপে প্রতিভাত হলেও সিনেমার পর্দায় দেখা ছবির মত, যথার্থ রক্তমাংসের জীব নয়। ফলে এদের অস্তিত্ব অপরের কল্পনাপ্রসূত তরঙ্গবিক্ষেপ হেতু কিংবা দর্শকের সংস্কারের প্রক্ষেপহেতু তা বলা কষ্টকর। কিন্তু এই সময় মাঝে মাঝে সুমধুর নানা গন্ধ নাকে এলে ও নানা শব্দ শ্রুত হলে বিভ্রান্তি জন্মে। তখন এ দর্শনকে মিথ্যে বলে মনে হয় না। এই দর্শন অত্যন্ত বিরল হয়ে আসে সপ্ততলে ওঠার পর। এর পর চৈতন্যশক্তি যখন মেরুদণ্ডপথে সহস্রারের বৃত্তমণ্ডলে আনন্দলোকে অর্থাৎ বিন্দুর বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে তখন জ্যোতি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। এসময় শক্তি জাগরকেরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে যান। দর্শন না হবার জন্য তাঁরা ভাবেন যে, তাঁদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের যে উন্নতি হচ্ছে এ কথাটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। যতক্ষণ দর্শন ততক্ষণ অলৌকিক বলে যা কিছুই মনে হোক না কেন—

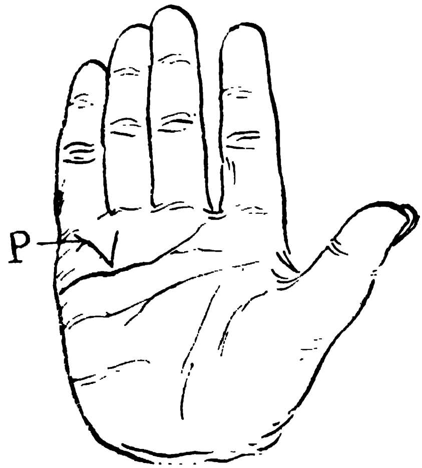
আসলে তা একধরনের সীমাবদ্ধতা। যখন দর্শন হারিয়ে জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশ করা যায় তখন নির্গুণ শূন্যতার কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়। এই জ্যোতিকে অনেকে সেইজন্য ঈশ্বরের জ্যোতি বা বিভূতি বলে বর্ণনা করেছেন। কিছুদিন এই জ্যোতির্মণ্ডলে ঘোরাফেরার পর শক্তিউত্তোলক নিজেরই মধ্যে দৈবী ক্ষমতা অনুভব করতে পারেন। তখন কোন মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দেখার জন্য যোগাসনে বসে জগৎসত্তার সূক্ষ্ম অংশে জীবকর্মফল প্রক্ষিপ্ত ছবি দেখার প্রয়োজন হয় না। চোখ বুজলেই—একধরনের দৈবী ভাষা প্রতীকের মাধ্যমে যেন কথা বলতে আরম্ভ করে। এটি যথার্থই দৈবীসত্তা প্রেরিত কোন সংকেত বা মানুষ নিজেই দৈবীসত্তায় উপনীত হন সেটা ভেবে দেখার মত। বর্তমান লেখকের মতে মানুষ নিজেই দৈবীসত্তা প্রাপ্ত হন। এবং একথা বলতে বোধহয় অহংকারের কিছু নেই, কারণ, আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই।

জ্যোতির্মণ্ডলে প্রবেশের পর কিভাবে সেই দৈবীসত্তা সংকেতময় ভাষায় জীবের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলে এবার সেই বিচিত্র রহস্যময় অভিজ্ঞতার কাহিনী বলছি। শ্রীমতী সবিতা সরকারের কাহিনী দিয়েই আরম্ভ করা যাক। প্রথম যখন তিনি আসেন, লেখক তাঁর ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন যোগদর্শনে। অর্থাৎ লালন ফকিরের আর্শিনগরে। কিন্তু শেষ দিকে তিনি যখন একদিন তাঁর দুই ছেলের চাকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—তখন চোখ বুজতেই তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন লেখক। ছবি এঁকে একটা জ্যোতির্ময় আলোক যেন সাংকেতিক ভাষাতে জবাব দিয়ে গেল। আকাশের মেঘ যেমন নানা আকৃতি ধারণ করে তেমনই একটি অনন্তবিস্তার জ্যোতি অদ্ভুত কিছু সাংকেতিক রূপ ধরে লেখককে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল শ্রীমতী সরকারের প্রশ্নের জবাব কি? শ্রীমতী সবিতা সরকারের দু'ছেলে শিবানন্দ ও

দেবানন্দ। শিবানন্দ ভারতীয় রেলবোর্ডের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে কাজের জন্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে দু'বছর লোক নেওয়া বন্ধ রাখার নির্দেশ আসে। দু'বছর পর যখন পুরানো প্যানেল থেকে লোক নেবার নির্দেশ আসে তখন অনেকের ডাক পড়লেও তার ডাক পড়ে না। ইতিমধ্যে দেবানন্দ এর পরের বার রেলওয়ে সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে। শেষ ইণ্টারভিউতে তার ডাক পড়েছে। শ্রীমতী সরকার বললেন, শিবানন্দ বড় ভেঙে পড়েছে। দেবানন্দের চাকুরী হয়ে যাচ্ছে অথচ ওর হচ্ছে না। ইতিমধ্যে কাগজে বেরিয়েছে নতুন লোক নেওয়া হবে না। কি হবে? লেখক সাধুও নন, সন্তও নন। দৈবী-ভাষা এবিষয়ে তার প্রতীকী নির্দেশ কি দেয় চোখ বুজে দেখবার চেষ্টা করলেন তিনি। যে প্রতীকী ভাষা ফুটে উঠল তা হল—শিবানন্দ কাজ পাবেই। দেবানন্দের কাজ হবে না। তিনি সেকথা বললেন, কিন্তু শ্রীমতী সরকার এতে বোধ হয় আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। সব কিছুই তো হয়ে গেছে দেবানন্দের। চাকুরী তাহলে আটকাবে কোথায়? দেবানন্দ জয়েন করার আগে শেষ ইণ্টারভিউতে যাবে। চাকুরী স্টেশনমাস্টারের। সুতরাং কালার টেস্ট দরকার। সামান্য একটু কালার টেস্টে ভুল করল দেবানন্দ। চাকুরী হল না। ইতিমধ্যে শিবানন্দের নিয়োগপত্র এসে গেছে। সে চাকরি পেয়ে গেল। কোন্ ছবি, কি প্রতীকী ভাষা লেখককে একথা বলে দিল তাই এবার ছবি এঁকে দেখানো যাচ্ছে। দৈবী ভাষা ফুটে ওঠার জন্য একটি পটভূমি চাই। সে পটভূমি সবচাইতে ভাল হয় যদি করতলকে পশ্চাৎপট হিসেবে নেওয়া যায়। লেখক মনে মনে শিবানন্দের ডান হাতখানা চিন্তা করলেন—তাতে যে ছবি দেখলেন তা এই ঃ

অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তার বুধের ক্ষেত্রে একটি জ্যোতির্ময় P শব্দ ফুটে উঠেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এক্ষেত্রের অর্থ যাই

হোক লেখকের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলে দিল, এই বুধ হচ্ছে তার কর্মক্ষেত্র। যেখানে সে উত্তীর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ Passed. শ্রীমতী সরকার যখন দেবানন্দ ও শিবানন্দ দু'জনের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন এই দক্ষিণ হস্তে যে চিত্র দেখে লেখক শিবানন্দের চাকুরী হবেই—এ কথা বলেছিলেন তা হল এই ধরনের ঃ

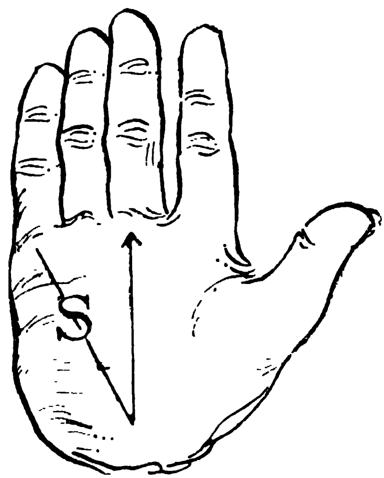


শিবানন্দের ডান হাত

অর্থাৎ বুধের ক্ষেত্র থেকে ভাগ্য রেখার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে একটি সরলরেখা। তাতে জড়িয়ে আছে একটি অক্ষর S. জ্যোতিষীরা একে বিজিনেস লাইন বলেন। কেউ বলেন লাইন অব হেপাটিকা, সাফল্যের লাইন। আবার কারো মতে এ হল হেলথ লাইন। যদি এ লাইন ক্ষীণ হয় এবং ভাগ্যরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে জীবনে সাফল্য আসে। কিন্তু এ লাইন যদি প্রবল হয়ে আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে শরীর খারাপ থাকে। এ সম্পর্কে ইংরেজীতে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে 'A strong health line indicates bad health.' সে যাই হোক জ্যোতিষীরা যাই বলুন, লেখকের অন্তস্তলের ব্যাখ্যা ছিল এই রকম ঃ রেখাটি কর্মপ্রাপ্তির। তাতে শিবানন্দের নামের আদি অক্ষর S হিসেবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং শিবানন্দের চাকুরী হবেই। এবং হয়েছেও। (ছবিটি পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই দৈবীভাষা অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি এঁকে নানা কথা বলে, যাকে বলা যেতে পারে Pictorial ল্যাঙ্গুয়েজ। এসব ব্যাপারে অদ্ভুত

অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে লেখককে। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দু'জন অধ্যাপক এলেন লেখকের কাছে। একজন এসেছিলেন সস্ত্রীক। এরা কেউ কিছু বললেন না। শুধু মহিলাটি বললেন, আমরা কিছু বলব না। আমাদের সম্পর্কে যা মনে হয় আপনিই বলুন।



শিবানন্দের ডান হাত

চোখ বুজে মহিলাটির প্রশ্ন শুনে তাঁর করতল চিন্তা করলেন লেখক। এবং স্বাভাবিকভাবেই তার বাম করতল মানসনেত্রে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন। তাতে যে ছবি প্রথম দেখলেন—তা এই রকম ঃ বৃহস্পতির ক্ষেত্রে একটি চতুষ্কোণ। তা চার ভাগে

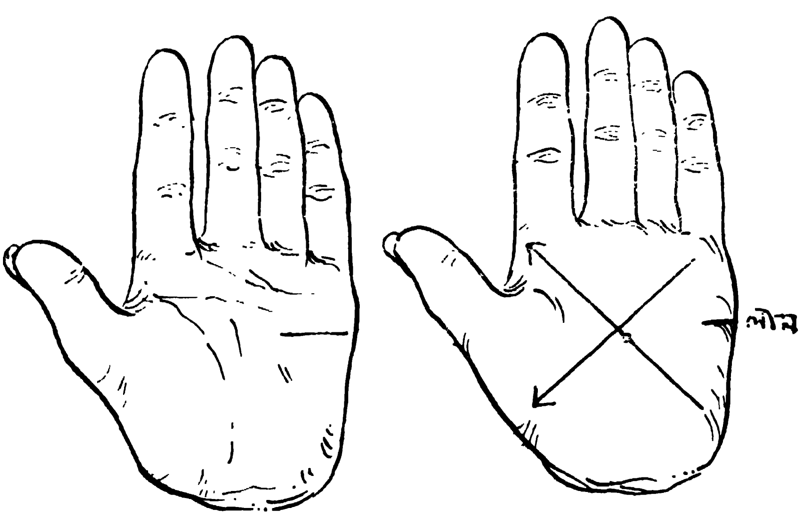


অধ্যাপক পত্নীর বাম করতল

বিভক্ত। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, এই হল তাঁদের গৃহস্থল। শুধু যদি জমি কিনতেন তাহলে কেবলমাত্র চতুষ্কোণ রেখা পড়ত। এ হল বহুতল গৃহ। সাধারণত আজকাল বহুতল গৃহ কেউ তৈরি করেন না। ফ্ল্যাট হিসাবেই এগুলি তৈরি হয়। লেখক অনুমান করে নিলেন তাঁরা একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। সে কথা বলতেই মহিলাটি স্বীকার করলেন।

দ্বিতীয় যে ছবি লেখক তাঁর হাতে দেখলেন তা পূর্ব পৃষ্ঠায় নিচের দিকে আঁকা ডান পাশের ছবির মত। হাতের তালুতে একটি চক্র। এই চক্র কালেরও প্রতীক হতে পারে; যানেরও প্রতীক হতে পারে। যাকে বলে ইনটুইশন। সেই ইনটুইশন লেখককে বলে দিল, এ হল গাড়ির চাকা, অর্থাৎ এদের গাড়ি আছে। বলতে সে কথাও স্বীকৃত হল।

তৃতীয়বার ভদ্রমহিলার করতলে মনোনিবেশ করতেই যে ছবি লেখক দেখলেন, তা হল এই: মঙ্গলের স্হানে ভদ্রমহিলার লাল রেখা। (বাঁদিকের ছবি) এই লাল রেখা অদ্ভুতভাবে ইঙ্গিত দেয়



অধ্যাপক পত্নীর বাম করতল

রক্তপাত জাতীয় কিছুর। এদের দেহে অস্ত্রোপচার হতে পারে। ভদ্রমহিলাকে তিনি বললেন, আপনার দেহে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি বললেন, আমার সম্পূর্ণ পেটই অপারেশনে ক্ষত-বিক্ষত।

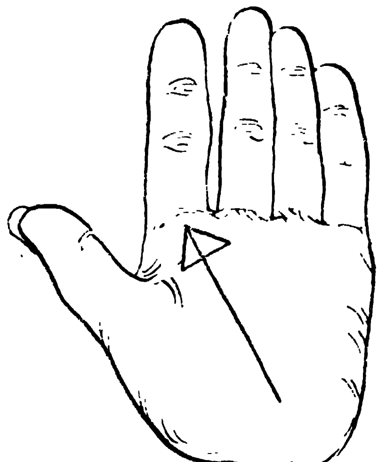
মহিলাটি এবার লেখককে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, আমার কয়টি সন্তান ? আবার লেখক তাঁর করতলে মনোনিবেশ করলেন। দেখলেন এই ধরনের ছবি ঃ (পূর্ব পৃষ্ঠায় ডান দিকের করতল)

বুধের ক্ষেত্র থেকে যে রেখা শুক্রে গিয়ে পড়েছে তা হল— প্রথম সন্তানের রেখা। মধ্যখানে লাল রঙের ক্ষুদ্র রেখা হল দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুরেখা। চন্দ্র থেকে বৃহস্পতিতে ওঠা তৃতীয় রেখা হল ভাগ্যবান ও রুচিবান সন্তানের চিহ্ন। এই ছবি দেখে লেখক মহিলাকে বললেন, আপনার তিন সন্তান। একটি সন্তান মারা গেছে। জ্যেষ্ঠ সন্তান বিনয়ী ও শিল্পবৃত্তিসম্পন্ন। কনিষ্ঠ রুচিসম্পন্ন ও স্হিতধী। মহিলার বিস্ময়ের অন্ত থাকল না। লেখককে পরীক্ষা করে দেখার মানসিকতা বোধ হয় তাঁর চলে গেল। আসলে যে প্রশ্নটি জানার তাঁর সব চাইতে বেশি আগ্রহ ছিল তিনি সবশেষে সেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, আমার স্বামী তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি পাবেন কিনা। লেখক যথারীতি চোখ বুজলেন। তাঁর বাম করতল ভেসে উঠল। তাতে দেখলেন বৃহস্পতির ক্ষেত্রে একটি আধ মোড়ানো ত্রিকোণাকৃতি ছাতা ফুটে উঠল। (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু ছাতার ডাট মাঝখান দিয়ে তাকে স্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃহস্পতি অর্থাৎ গৃহে ত্রিকোণ রেখা দেখে লেখকের এই মনে হল যে, পৈতৃক নয়, সম্পত্তি মাতৃক। মহিলা বললেন, হ্যাঁ। বাড়ি শাশুড়ীর নামে। আমার স্বামী এ সম্পত্তি পাবেন তো ? লেখক বললেন, কেন পাবেন না ? পাবেন। তবে সম্পত্তি বিভক্ত হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কেন, উনি তো এক ছেলে মাত্র : লেখক বললেন তাহলে নিশ্চতররূপে ও'র এক বোন আছে।

—আছে। কিন্তু সে-ত বিলেতে। বড়লোক।

—কিন্তু ঘর তো দেখা যাচ্ছে বিভক্ত, সুতরাং বোনও পাবেন। পরে ভদ্রমহিলার শাশুড়ী লেখকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সত্যিই তাই। তিনি উইল করে বাড়ি দ্বিধা বিভক্ত করে রেখেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে নিশ্চয়ই এমন কোন কথা নেই, এমন কোন রেখাও নেই, অথচ দৈবী ভাষায় কী আশ্চর্য ইঙ্গিত !

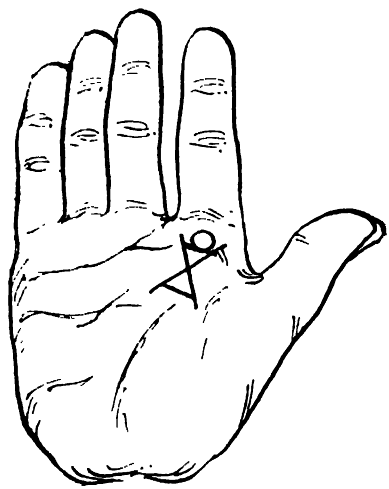


অধ্যাপক পত্নীর বাম করতল

টালিগঞ্জ সুইস পার্কের মুখে একটি ছেলে থাকে। তাকে লেখক একটি কথা বলেছিলেন যা খেটে গেছে, অর্থাৎ চাকুরী। একদিন হাতীবাগান থেকে তার এক সহকর্মী বন্ধুকে নিয়ে এল ঃ মেশোমশাই, একে কিছু বলে দিন। যথাযথ তার ডান হাত চিন্তা করতেই লেখক দেখেন এই ছবি, অর্থাৎ বৃহস্পতির ক্ষেত্রে লাল রেখা দ্বারা অঙ্কিত একটি মানুষের ছবি যেন পড়ে আছে। এর অর্থ লেখকের মনে হল গৃহে মর্মান্তিক রক্তক্ষরণজনিত রোগে পড়ে গিয়ে কারো মৃত্যু। লেখক বললেন বাড়িতে স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে কার? ও বলল, আমার বাবার, আশ্চর্য তো !

লেখক বললেন, পৃথিবীতে আশ্চর্য অনেক কিছুই আছে। অধুনা পশ্চিমী অধিমনোবিজ্ঞান এর হদিস করার চেষ্টা করছে, পারছে না। কারণ, এ ক্ষমতা সাধারণত জটিল মানসিকতা-

সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির হবার নয়। কারণ, সাদাসিধে মনের উপরই অতীন্দ্রিয়ের ছায়া পড়ে এমন হয়। অবশ্য এ হবারও কিছু ব্যাখ্যা আছে। একে রাশিয়ানরা wave length তত্ত্ব বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন বর্তমান বিষয় সামনে না থাকলে wavelength আসবে কি করে সেটা ভেবে না পেয়েই রুশ অধিমনোবিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়েছেন। কিন্তু কিভাবে সেই সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দর্পণসদৃশ viscous জাতীয় অবস্থাতে জগতের সকল চিত্র ফুটে থাকে সে কথা আগেই লেখক বলেছেন। সেই স্বচ্ছ অবস্থার স্বরূপ জেনে বিজ্ঞানীরা যদি হাতে-নাতে যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ পেতে চান তাহলে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যন্ত্রই নানা wave-length ধরে দৈবী-ক্ষমতার পরিচয় দেবে। এটি অধ্যাত্ম ব্যাপার তো বটেই তবে কেউ যদি একে বিজ্ঞান ছাড়া মানতে রাজী না হন তবে বিজ্ঞান সাধনার সাহায্যেও যে এসব ক্ষমতা যন্ত্রের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে লেখক সেকথা স্বীকার করেন। একে অধ্যাত্ম বলা হয় এই কারণে যে, অধি-আত্ম সম্পর্কিত জগতের কথা রয়েছে এখানে—অর্থাৎ স্থূল প্রাণিজগতের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম সত্তা আছে যার নাম আত্মা এ হল সেই আত্মার জগতের কথা। স্থূল জগতের অর্থাৎ জীবাত্মার স্থূল দৃষ্টির বাইরে (beyond) বলে একে অধি-আত্ম বা অধ্যাত্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে।



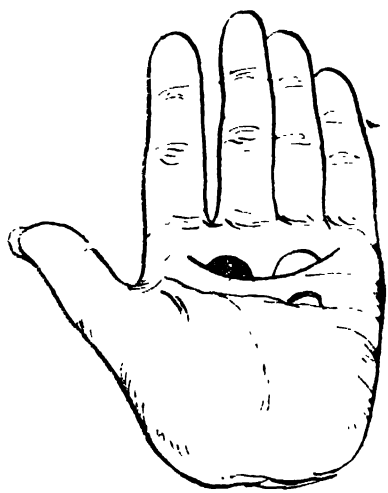
হাতি বাগান থেকে আসা
ছেলের ডান হাত

এই wavelength তত্ত্ব যে কতভাবে কাজ করে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। শ্রীমতী মায়া চৌধুরী—থাকেন টালিগঞ্জে নেতাজীনগরে। একদিন দেখা করতে এলেন—তাঁর মেয়ে থাকে আমেরিকাতে, খবর পাচ্ছেন না। লেখককে বললেন, দেখুন না একটু। চোখ বুজে এবার কোন পশ্চাৎপট না ভেবেই লেখক দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, ঘরে বসে চিঠি লিখছে একটি মেয়ে। মনের স্বচ্ছ দর্পণে জ্যোতিরেখায় মেয়েটির ছবি পর্যন্ত ফুটে উঠেছে। লেখক দেখলেন, চিন্তার কারণ নেই—সে ভাল আছে। মিসেস চৌধুরীকে বললেন, আজকের তারিখ মনে রাখুন। এই তারিখে মেয়ে চিঠি লিখছে। আসবে যে কয়দিন সময় লাগে তারই মধ্যে। দেখা গেল ঠিক নির্দিষ্ট দিনেই চিঠি এসেছে। এবং ঐ তারিখেই চিঠিটি লেখা। প্রশ্ন, কি করে সুদূর আমেরিকাতে তার মেয়ের খবর এনে দেওয়া লেখকের সম্ভব হল? বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতে গোপন রহস্যটি এই রকম ঃ মেয়ের প্রশ্ন করার সময় স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের একটি চিত্রকল্প তার মায়ের মাথায় ফুটে উঠেছিল। লেখকের Receptive মস্তিষ্কস্নায়ু সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নায়ুতরঙ্গ ধরে ফেলে এবং এই চিত্ররূপটি যেখানে রয়েছে চিত্রকল্প অনুরূপ সেখানে গিয়ে তা স্পর্শ করে। ফলে তার ছবিটি লেখকের মস্তিষ্কস্নায়ুর টি. ভি. সেটে তরঙ্গাকারে এসে ধরা পড়ে।

আর একবার মিসেস চৌধুরী মেয়ের সম্পর্কে জানতে এসেছিলেন। সেবার তাঁকে লেখক বলেন, তার মেয়ে সন্তানসম্ভবা। মায়া চৌধুরী সে কথা বিশ্বাস করতে চান না। কারণ, বিবাহিত হয়ে স্বামীর সঙ্গে আমেরিকাতে থাকলেও তখন সে লেখাপড়া করছে। লেখাপড়ায় বিঘ্ন হয় এমন কোন কাজ সে করবে না বলেই তাঁর ধারণা। কিন্তু কিছুদিন পরেই চিঠি এসে হাজির, মেয়ের সন্তান সম্ভাবনা। দেখাশুনার জন্য মাকে আমেরিকায় যেতে

হবে। এবং সত্যি সত্যি, গত বছরের জন্ন মাসে (১৯৮৭ জন্ন) তিনি আমেরিকা যান।

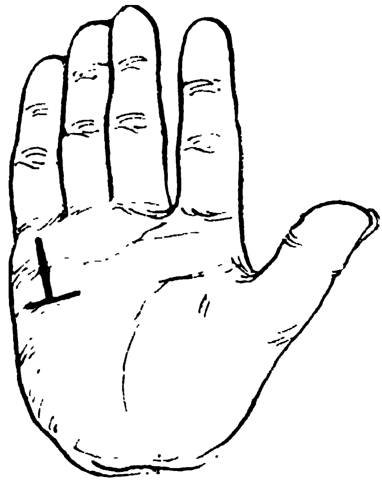
দৈবী ভাষা যে কত অদ্ভুত রকমের হয়, তা বলার নয়। জনৈকা মহিলা লেখককে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর বাবা-মার কথা। তাঁর করতলে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে লেখক দেখেন এই ধরনের ছবি ঃ তার পিতৃরেখায় দন্টো চোখ। একটি চোখ অন্ধকারে ঢাকা। অর্থাৎ সে চোখের দৃষ্টি নেই। সেকথা বলতে মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, অপারেশন করতে গিয়ে সে চোখের দৃষ্টি একেবারেই হারিয়ে গেছে। মায়ের ক্ষেত্রে লেখক দেখেন আয়ন্রেখার ঊর্ধ্ব দিকে কিছন্টা অংশ elevated, অর্থাৎ টিউমারের মত। লেখক বললেন, আপনার মায়ের কোন টিউমার জাতীয় রোগ হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং ডাক্তার সন্দেহ করছেন—ক্যান্সার।



একটি মহিলার হাত

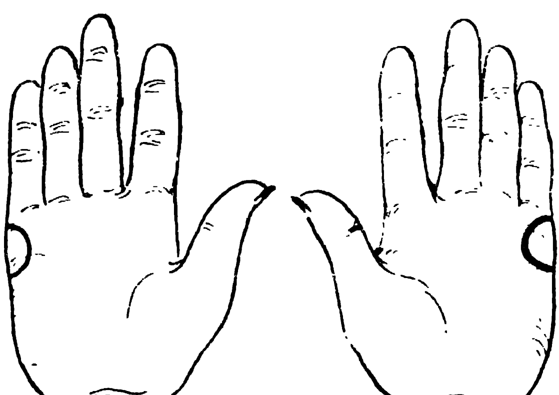
টন্স্পা নামে একটি মেয়ে। পড়ে যাদবপন্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামন্লক সাহিত্য নিয়ে। সে একদিন তার এক আত্মীয়াকে নিয়ে এল। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে আছে। নতুন একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয়। লেখককে পরীক্ষা করার জন্য বলল, বলন্ন তো, ছেলেটি কি করে ? সঙ্গে সঙ্গে একটি পন্রন্ষমানন্ষের করতল চিন্তা করে লেখক দেখেন এই ধরনের ছবি ঃ বন্ধ থেকে একটি রেখা নেমে এসে লাল রঙের মঙ্গলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লেখক বললেন, যাই করন্ক ভূমির সঙ্গে তার কর্ম যন্ক্ত। *জানা গেল ছেলেটি O. N. G. C.-তে*

কাজ করে। মেয়েটি দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, সে এখন কোথায় বলতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটি ছবি দেখেন লেখক। ছবিটি এই ধরনের, শুরু স্থান থেকে একটি সারস বুধের দিকে উড়ে চলেছে। কে যেন বলে দিল শুক্র হল ওর সক্ষেত্র। সেখান থেকে সারস পাখির উড়ে যাওয়া হল—কর্মক্ষেত্রে দূর-বর্তী স্থানে বদলী হওয়া। বলতেই মেয়েটি স্বীকার করল।



ছেলেটির হাতের রেখা

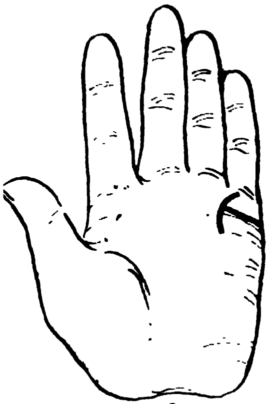
এ ধরনের কত বিচিত্র দৈবী-ভাষা যে আপাত অসম্ভব প্রশ্নের জবাব দেয় তা বলা দুঃসাধ্য। কখনও সে জবাব আসে স্পষ্ট ছবির



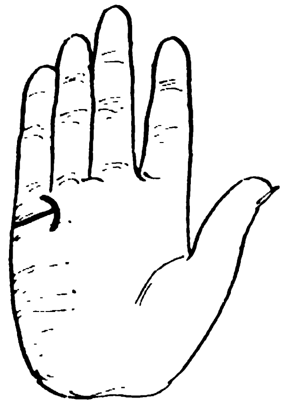
১ ২

মাধ্যমে, কখনও প্রতীকের মাধ্যমে। কিভাবে যে দৈবীসত্তা তার জবাব জানাবেন, তা বলা দুঃসাধ্য। একই প্রশ্নের হয় তো

বিভিন্ন প্রতীকে জবাব আসবে, যথাযথ ধরাটাই প্রশ্ন। কেউ যদি জানতে চায়—তার ছেলের বিয়ে হবে কিনা, বা মেয়ের, তাহলে ছেলে বা মেয়ের করতল চিন্তা করলে এই ধরনের ছবি ফুটে উঠতে পারেঃ ১ ও ২ নম্বরে বুধের ক্ষেত্র থেকে বক্ররেখা মঙ্গলের প্রান্তভাগ

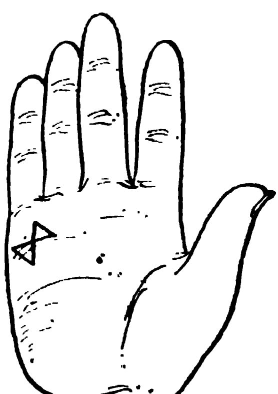


৩

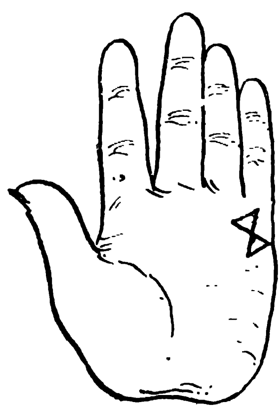


৪

পর্যন্ত স্পর্শ করা। এক্ষেত্রে বিবাহ আসন্ন। ৩ ও ৪ নম্বর ছবিতে বুধের ক্ষেত্র থেকে বক্ররেখা নামতে নামতে একটি কীলক সদৃশ



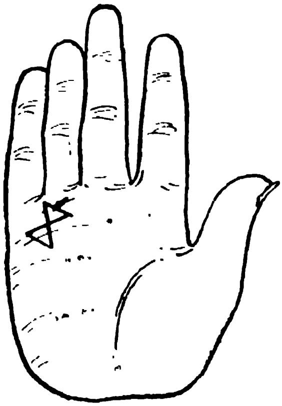
৫



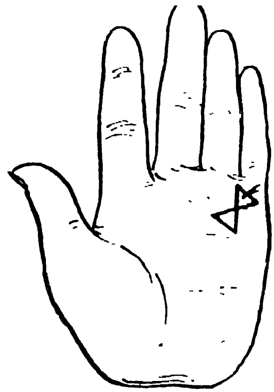
৬

দণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর অর্থ বিবাহ ঠিক হয়ে যে-কোন কারণেই হোক তা[illegible]ছে। ৫ ও ৬ নম্বরে বুধের ক্ষেত্রে

প্রজাপতির মত পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠলে বিবাহ হচ্ছেই, এবং খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু ৭ ও ৮ নম্বরের ছবির মত যদি প্রজাপতির

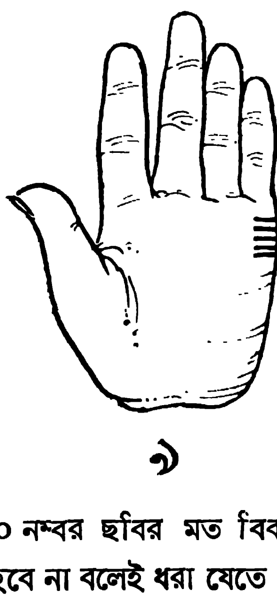


৭

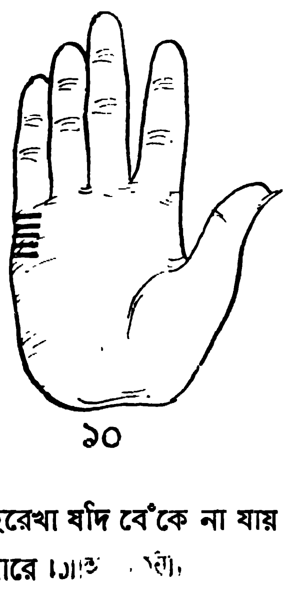


৮

কোন ডানায় একটু ফাঁক থাকে তা হলে এমন বিবাহের চেষ্টা বোঝায় যা অল্প সময়ের মধ্যেই হবে অর্থাৎ বিবাহ হবে। সর্বশেষে



৯

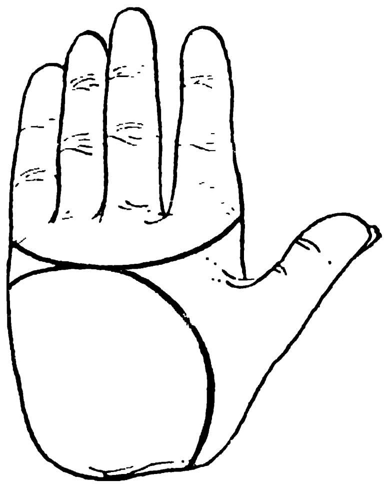


১০

৯ ও ১০ নম্বর ছবির মত বিবাহরেখা যদি বেঁকে না যায় তাহলে বিবাহ হবে না বলেই ধরা যেতে পারে।

কারো বাবা বা মা বাত দ্বারা আক্রান্ত কিনা বুঝতে হলে রেখাগুলি এরকম দেখা যায় ঃ পিতৃমাতৃরেখা যতটা কার্ভড হবে ততটাই বাতের লক্ষণ। তা ছাড়া বাত বোঝাবার জন্য সবুজ একটা আলো রেখার প্রান্তভাগ ছুঁয়ে থাকে। কোন এক বিশ্ব বিদ্যালয়ের জনৈক U. G. C. অধ্যাপক লেখকের সঙ্গে প্লেটোর শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে এলে লেখক তাঁকে বলেছিলেন আপনার (সম্ভবত) দক্ষিণ অঙ্গে বাত আছে। তিনি স্বীকার করেছিলেন।

লেখক সবচেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বোধ হয়—J. K. Dasgupta-এর ক্ষেত্রে। তিনি সরাসরি একদিন লেখকের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে বললেন, দাদা, কলকাতার প্রায় সব জ্যোতিষীকেই দেখিয়েছি—আমার এ রেখাটির অর্থ কেউ বলতে পারেন নি। তিনি যে রেখাটিতে দেখালেন তা এই রকম ঃ অর্থাৎ পিতৃমাতৃ বা হার্ট ও হেডলাইনের মধ্যবর্তী একটি রেখা। লেখক জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানেন না, তবু অন্তরের অন্তস্তল থেকে মুহূর্তের মধ্যে কে যেন তাঁকে এর অর্থ বলে দিল। লেখক বললেন, এ রেখার অর্থ পিতা বা মাতার তরফে দু'পুরুষের মধ্যে কারো দু'বিয়ে। তিনি বললেন, আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলেই নির্দিষ্ট পুরুষের মধ্যে দুই বিয়ে আছে। (চিত্রটি পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



কার্ভড নির্দেশক

লেখকের কাছে নিত্যদিন এনিয়ে কত মানুষ যে দেখা করতে চান কি বলব! কিন্তু এ নিয়ে তাঁর কোন নেশাও নেই, পেশাও

নেই। আর ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে সাধুসন্ত হবার ইচ্ছেও নেই। অথচ এ এক অদ্ভুত বিদ্যা যা লেখককে নিজেকেই চমকে দেয়। সেই সঙ্গে অবাক করে দেয় যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁদেরও। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, লেখকের সঙ্গে দেখা করুন বা লেখক বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। সাধারণত এ নিয়ে লেখক এখন খুব বেশি একটা কথাই বলেন না। কিছু কিছু নামের উল্লেখ করে এ-সব বলার মানে, এইটুকু প্রমাণ করা যে, লেখক মিথ্যে বলেননি। অধিমনোবিজ্ঞানীদের মত লেখকেরও এ এক বিরাট অনুসন্ধিৎসা। সেই অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্যই ব্যাপকতর সমীক্ষা। লেখক আজও বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে। তবু, সবার উপর কিছু একটা আছে বলে মাঝে মাঝেই তিনি বোধ করেন, কারণ, এবিদ্যা লেখককে কেউ দেননি। তবে কি



জে. কে. দাশগুপ্তের করতল

করে এল? সংকেতময় ভাষাগুলোর অর্থই বা তাঁকে ভেতর থেকে কে বলে দেয়, সেই অন্তস্তলের গভীর রহস্যের স্বরূপ এখনও লেখক ভেদ করতে পারেননি। জ্যোতির্ময় ধোঁয়ার মত যে মেঘ রূপ পাল্টে ছবি এঁকে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, সেই মেঘই বা কি? অধ্যাত্ম পুরুষেরা বলেন, ঈশ্বরের বিভূতি। সত্যিই কি তাই? এই জ্যোতির্ময় বিন্দুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে যখন স্বচ্ছ কাঁচের মত জগৎ ভেসে ওঠে লেখক সেখানে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করেন। আরও অবাক হন যখন নিবিড় নিদ্রার মত একটা

গভীর প্রশান্তির মধ্যে কিছুক্ষণ হারিয়ে যান। ফিরে এসে দেহ মনকে মনে করেন স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ। অপূর্ব এক ভাললাগায় তখন তাঁর সমগ্র চৈতন্যসত্তা ভরে যায়। তখন লেখকের মনে হয়, এই শেষ লাভটুকুই যথার্থ লাভ, আর সবই মিথ্যে। সুখ, সম্পদ, নাম, যশ, ভোগ, সবার চাইতে বড় হল প্রশান্তি। শোনা যায়, ঈশ্বর মানুষকে সব কিছু দিয়ে শুধু এই প্রশান্তিটুকু নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। নির্বিকার নীরবতায় সেখানে হয়তো ঈশ্বরের কোলে বসে তাঁর সঙ্গে সেই প্রশান্তিটুকুই ভাগ করে নেন লেখক। অথচ ঈশ্বরে আজও তো তাঁর আস্থা জন্মে নি!